

বাদুরের মাংস চুরি জিহ্বাকে একটা মতলব এনে দিলো।
ও মাংসের দোকানে গিয়ে বড় দেখে হাড় সমেত এক খণ্ড
মাংস নিয়ে এলো। তারপর সেটা একটা মডেল স্পেস জেটে
বাঁধলো।

তুমি ওটাতে যে অদ্ভুত গুঁড়ো দিয়ে
প্রলেপ লাগাচ্ছে ওটা কি জিহ্বা?

কিছু মনে করোনা।
শুধু এটা আমার
হাত থেকে ফেলে
দেওয়ার মতো
কিছু করোনা।

আড়ালে থেকে জিহ্বা স্পেনটাকে পাঠালো
হাড়টাকে টেনে শোঁ-শোঁ শব্দে স্পুধার্ত
বাদুরের নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে
যাবার জন্যে।

হুউস-স!

গন্ধা গুঁকে পেটকের মতো উড়ন্ত কুকুরটা
ওটাকে ধাওয়া করার জন্যে উঠে পড়লো।

জাহ্ন!
ফিরে আস
বাদুর!

নির্বোধের মতো
ঐ হাড্ডিটাকে তাড়া
করা থামাও! নীচে
নেমে এসো!

জিহ্বা স্পেনটাকে সব
রকম বিমান চালনার
কৌশল প্রয়োগ করে
হাড়টাকে দানবাকৃতি
কুকুরের নাগালের
বাইরে রেখে দিলো।

তারপর জিহ্বা প্রকৃতপক্ষে
তার কৌশলের অ্যাসল খেলা
দেখালো স্পেনটাকে ঝাঁপ
খাইয়ে ক্যাপ্টেন জ্যাপের দ-
পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়ে গিয়ে।

জুলপস! এসব
কি ঘটে চলেছে?

স্পেন আর হাড়টা ক্যাপ্টেন জ্যাপের পায়ের ফাঁক দিয়ে
ঠিকই বেরিয়ে গেলো, কিন্তু শূন্যলোকের পাজিটা জোর
ধাক্কা খেলো যখন বাদুরের অকুসরণের চেষ্টা করলো।

না! বাদুর, না!
ওটা কোরোনা! তুমি
কখনই- জোই-ই-ই!

ধড়াম!



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ডায়মন্ড কমিক্সেস

কার্টুনিষ্ট প্রাণের চিরনতুন চরিত্র



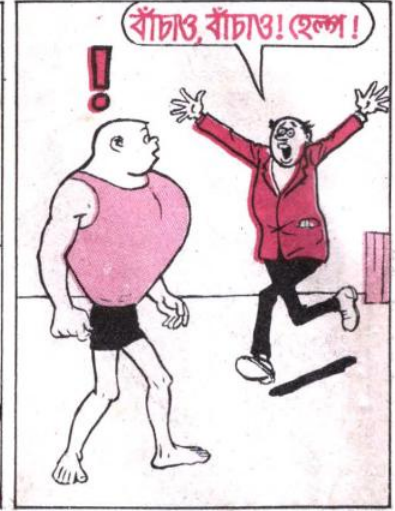
কুরুক্ষেত্র হওয়া কুরু-পান্ডবের ধর্ম-যুদ্ধের অত্যন্ত সজীব চিত্রন। যে যুদ্ধে পান্ডবেরা বিজয়ী হয়েছিল। যে কোনও বয়সের পাঠকের জন্য অত্যন্ত রোচক এবং সংগৃহীয়। মূল্য-15/-

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামের ঘটনা প্রধান জীবনের অত্যন্ত রোমাঞ্চক কাহিনী। বান্ধা-বুড়ো সবার জন্য সমান-ভাবে মনোরঞ্জনক। মূল্য-15/-





বাঁটল দি থ্রেট





সূচীপত্র

আষাঢ় ১৪০১

জুন ১৯৯৪

শ্রুতাবা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত ছোটদের সেবা
মাসিক পত্রিকা

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

একগুচ্ছ ভূতের গল্প □

- ভূতুড়ে খেলোয়াড়
—রবিদাস সাহারায় ১০
বেগমসাহেবা—মঞ্জিল সেন ৬
বুঢ়া পীরের দয়ায়
—মুস্তাফা নাশাদ ২০
সিধুমামার বাড়ি
—অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪
কানে কানে কথা কয়
—অসীম চৌধুরী ৩৬
গলায়-দড়ির আমবাগানে
—ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় ৬৮
ভূতুড়ে ডাঙার ভয়ঙ্কর রাত
—সমীর ধর ২৯

প্রচ্ছদ □

- মহাকাশের আজব দেশে
—নারায়ণ দেবনাথ

ধারাবাহিক □

- অরণ্যপতি টারজান
(আডভেঞ্চার)—সব্যসাচী ২৬

অমর বীর কাহিনী □

- বেদগাওঁয়ের সেই যুদ্ধ
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২

পুরস্কৃত গল্প □

- মাঘের শীত (প্রথম)
—বিপ্লব পাল ৫০
জীবন্ত সরস্বতী পূজো (দ্বিতীয়)
—অশোককুমার প্রধান ৫১

ফিচার □

- খুনী ভূত—সঙ্করষণ রায় ৭২
গল্প নয়—প্রিয়রঞ্জন মৈত্র ৬৩
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪১
ভবিষ্যতের ঠিকানা
—ডি.এ. চন্দ্রণ ৪৪

বিশ্ববিচিত্রা □

- জিগ্জাসা ৬৫
সত্যি! ৪৬

কবিতা □

- ভূতদের বাসা—তপতী চক্রবর্তী ৫



ক্রীড়াঙ্গন □

- খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
পড়ার সঙ্গে খেলা—স্বপন বক্সী ৬১
ক্যামেরার জোড়া তারকা
—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৬২

বিভাগীয় লেখা □

- দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৭

ছবিতে গল্প □

- বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৩২
সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক অভিযান
(রঙিন)—পল্লব পূততুণ্ড
ও দোলা পূততুণ্ড ১৮
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ২৪
বিলির বুট (রঙিন) ৬৬

ঘোষণা □

- নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৫২
জানো কী ৪৫

APPROVED BY THE DIRECTORATE
OF PUBLIC INSTRUCTION WEST
BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY
MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17).
T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা।
ডাকে : বুক পোস্টে - ১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে
১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh—Rs. 235.00
U.K. and U.S.A.—By Sea Mail Rs. 327.00
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম : ৮ টাকা মাত্র

নিউ বেঙ্গল প্ৰেস সন্মিত সন্মিত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশিনী	অগ্নিমিত্রের দেশ থেকে দেশান্তর	ডঃ দীপক চন্দ্রের হরিবংশ
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রিকেট মাঠের বাইরে

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার দোলায় দুলিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরলো।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের পেরুতে সূর্য লাল	দিলীপ ভট্টাচার্যের প্রবাস প্রেম	আভা বসুর সাগর দুহিতা
---	------------------------------------	-------------------------

দেবনারায়ণ গুপ্তের

বাংলার নট-নটী

শতদল ভট্টাচার্যের

নিশুতি রাতের মহাত্মা

ময়ূখ চৌধুরীর দেবী দর্শন	ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর বিপন্ন প্রকৃতি	রাধারমণ রায়ের অদ্ভুত গোয়েন্দা
-----------------------------	---	------------------------------------

শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)



ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

ফুটবল খেলার আইন কানুন



ফুটবল ক্রিকেটের আইন



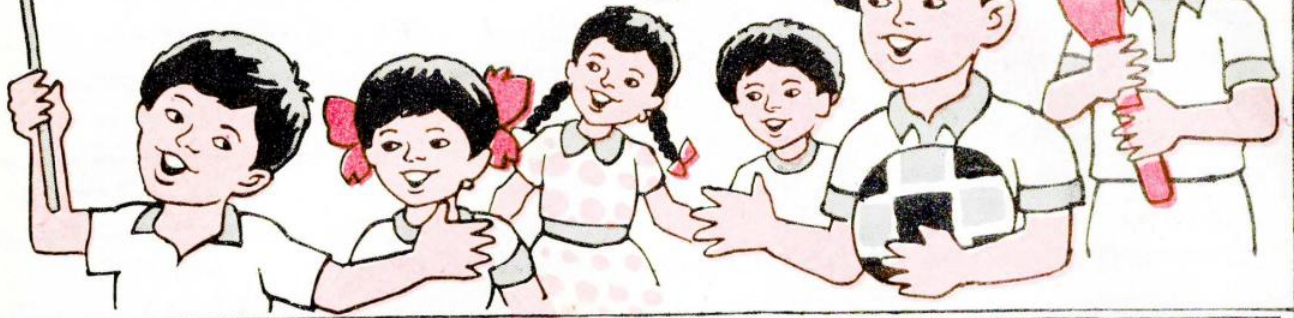
দীপংকর বিশ্বাসের মজানো দশ	অরুণ সর্দারের অনাহৃত	আশুতোষ মন্ডলের নতুন আলো
------------------------------	-------------------------	----------------------------



নিউ বেঙ্গল প্ৰেস (প্ৰাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩



শুকতারা



৪৭ শ বর্ষ • ৫ম সংখ্যা • আষাঢ় ১৪০১/জুন ১৯৯৪



ভূতদের বাসা তপতী চক্রবর্তী

‘চুপচাপ চারদার, চাঁদ নেই আকাশে,
ভূত ভূত গন্ধ ভাসে বুঝি বাতাসে!
অশথের ডালে থাকে মস্ত সে দত্তি,
লাল লাল দুটো চোখ, মিছে নয়, সত্যি!
ইয়া বড় শিং তার, কুলো কান লটপট,
মুলো মুলো দাঁত দিয়ে হাড় ভাঙে মটামট।
মাঝরাতে নাচ ধরে চারিদিক কাঁপিয়ে,
দলবল নিয়ে ঘোরে মাঠ-ঘাট দাপিয়ে।
একা যেন যেও নাকো পুকুরের ঐ পাড়,
মেছো ভূত থাকে হোথা, মটকেই দেবে ঘাড়।
শ্যাওড়ার ডালে থাকে পেতিনীরা এক ঝাঁক,
সারা গায়ে মাখে শুধু কাদা আর পচা পাঁক।
বাজপড়া তালগাছে এক যক্ষের বাস,
টাকা গুনে গুনে তার কভু মেটে নাকো আশ।
অমাবস্যার রাতে শাঁকচুম্বির দল
বৌ-ভুবি খাল পারে নাচে, হাসে খলখল।
মুণ্ডতে গেণ্ডুয়া খেলা চলে খুব জোর,
হাঁ-হাঁ-হিঁহিঁ-খিকখিক শ্মশানেতে মজা শোর।’
ভেবেছো কি ভয় পাই? আমি জানি সত্যি
মানুষেরই মনে ঠাসা ভূত-প্রেত-দত্তি!



ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

ডাকবাংলোটা একটা টিলার ওপর। নিচে চারপাশে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাইনের বন। পাহাড়িদের বসতিও
আছে, কিন্তু তা বেশ দূরে, বন ভেদ করে তা চোখে
পড়ে না।

ভৌমিক আর শাহিদ যখন ডাকবাংলোয় পৌঁছালো তখন পড়ন্ত
বেলা, নেমে এসেছে এক আশ্চর্য স্তব্ধতা। পাহাড়ি এলাকায়
সন্ধ্যা যখন নামে, বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়, শহরে
গঞ্জে বসে তা কল্পনাও করা যায় না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার,
বড় বড় গাছের কালো কালো ছায়া। মাঝে মাঝে বন্যপ্রাণী আর
রাতজাগা পাখির ডাক ভেসে এসে নিঃসীম স্তব্ধতাকে ভয়াবহ
করে তোলে।

ডাকবাংলোর চৌকিদার ওদের জন্য একটা ঘর খুলে দিল।

বেগমসাহেবা

মঞ্জিল সেন

বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা ওরা যেন জমে গিয়েছিল। ঘরের জানালাগুলো
কাচের, ওগুলো বন্ধ থাকায় ভেতরটা বেশ আরামদায়ক। চৌকিদার
ওদের অবস্থা দেখে একটা লোহার পাত্রে গনগনে আগুন দিয়ে
গেল। হাত-পা সেকতে সেকতে ওদের মনে হলো এত আরাম
বোধহয় দুনিয়ার কোথাও নেই।

চৌকিদার গরম চা বানিয়ে নিয়ে এসে জিগ্যেস করল রাত্তিরে
কি রান্না হবে। মুর্গি হতে পারে এ কথাও জানালো।



‘এই জন্মটি ঠাণ্ডায় ঝিচুড়ি দারুণ জন্মবে’, তৌফিক বলল।

‘ঠিক বলেছিস’, শাহিদ সাময়িক দিল, ‘মুর্গির মাংস তো হরদমই খাচ্ছি, কিন্তু এমন কনকনে ঠাণ্ডায় মুর্গির চাইতে গরম গরম ঝিচুড়ি আর ডিম ভাজা....ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে।’

‘তবে তাই হোক।’ তৌফিক চৌকিদারকে বলে দিল ঝিচুড়ির মধ্যে যেন বড় বড় আলু আর ফুলকপি ছেঁড়ে দেয়। চৌকিদারের কাছে মাখন আছে, পাতে ঝিচুড়ির সঙ্গে মেখে নিলে তেজস্বী হবে।

সতাই খাওয়াটা দারুণ হলো, একটু বেশিই হয়ে গেল। দুজনেরই পেট আইচাই করছে, তাড়াতাড়ি শুতে পারলে যেন বাঁচে।

চৌকিদার দুটো করে কম্বল দিয়ে গেল। তার আগে তার বউ এসে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। চৌকিদারের ঘর ডাকবাংলোর লাগোয়া। ওটাও সরকারি বাসা।

উত্তরপ্রদেশের এমন পাহাড়ি অঞ্চলে ডাকবাংলোই হলো ভ্রমণবিলাসীদের প্রধান ভরসা। যেখানে কোনো হোটেল, ধরমশালা বা চিট নেই, সেখানে ডাকবাংলো না থাকলে গাছের তলাই একমাত্র আশ্রয়।

তৌফিক আর শাহিদ দুজনেই থাকে কলকাতায়। বেগবাগানের মোড় থেকে ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে। ওরা দুজনেই বনেদী পরিবারের ছেলে। তৌফিকের এক নানা গভর্নমেন্টের উচ্চপদে কাজ করতেন। আর শাহিদের পূর্বপুরুষ উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় আসে গিয়ে ডেরা বেঁধেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। অযোধ্যার নবাব বংশের রক্ত ছিল সেই পূর্বপুরুষের শরীরে।

তৌফিক আর শাহিদ এবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার পরেই ওরা বেরিয়ে পড়েছে বেড়াতে। অযোধ্যায় শাহিদের পূর্বপুরুষের ভিটে দেখতেও গিয়েছিল ওরা। আগে নাকি ওখানে একটা হাভেলি ছিল, এখন তা ভেঙে সরকারি কলাভবন হয়েছে। ওখানে একটা চিত্রশালাও আছে। সেখানে মোগল আমলের চিত্রকলার সঙ্গে অযোধ্যার নবাব পরিবারের কিছু ছবিও চোখে পড়ে।

অযোধ্যা থেকে লঙ্কোতে দুদিন কাটিয়ে ওরা এসেছে এই জায়গায় বেড়াতে। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ওদের বলেছিল লঙ্কোয়েরই এক হোটেলের মালিক। ওই হোটেলেরই উঠেছিল ওরা। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছিল যে অবস্থায় নবাব পরিবারের সঙ্গে হোটেল মালিকের পূর্বপুরুষের একটা সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ শাহিদের সঙ্গে লতায়-পাতায় তাঁর একটা সম্পর্ক আছে।

হোটেল মালিকের নাম হাসান আলি। তাঁর ছোট্ট আফিসে এক অপূর্ণ রূপসী মহিলার ছবি দেখে ওরা দুই বন্ধু চমকে উঠেছিল। ওই ছবিটা অযোধ্যার কলাভবনেও চোখে পড়েছিল ওদের। ছবির চোখ দুটো যেন জীবন্ত। ওরা জিজ্ঞাস্য করে জেনেছিল ছবিটা



শাহিদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে।

অযোধ্যার এক নবাবের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছোট্ট বেগমের। শিল্পী মন-প্রাণ ঢেলে এঁকেছিলেন ছবিটা। ঠিক যেন সদ্য ফোটা এক বসরাই গোলাপ।

শাহিদের প্রশ্নের জবাবে হাসান আলি মুচকি হেসে বলেছিলেন, ওই বেগমের এক দৌহিত্রের বংশধর হলো শাহিদ, আর সেই দৌহিত্রের মাতুল বংশের হলেন তিনি নিজে। মূল সম্পর্কটা যদিও ছিল খুব ঘনিষ্ঠ কিন্তু আজ দুশোরও বেশি বছর পরে তা অসংখ্য ডাল-পালা ছড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে।

হাসান আলির মুখেই ওরা শুনেছিল ওই বেগমসাহেবা ছিলেন খুব তেজস্বিনী আর স্বাধীনচেতা। হারেমের মধ্যে বিবি সেজে বসে থাকবার মহিলা ছিলেন না। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার পূর্ণ করার জন্য অযোধ্যার বেগমদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের সোনা-জহরতের দিকেও বাড়িয়েছিলেন লোলুপ হাত, তখন একমাত্র এই ফতিমা বেগমই ঝাঁকি দিতে পেরেছিলেন তাঁদের। তিনি নাকি প্রচুর অর্থ আর অলঙ্কার নিয়ে পুরুষের হৃদয়বেশে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ পরিশ্রুতি জানা যায়নি, তাঁকে আর দেখাও যায়নি।

শাহিদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে। কোন রহস্যের আড়ালে হারিয়ে গেলেন এই তেজস্বিনী? শাহিদের মনে হয়েছিল ছবির চোখ দুটো যেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটা অদ্ভুত শিহরন বয়ে গিয়েছিল ওর সারা শরীরে।

শেষের আগে চৌকিদার ওদের বলল, ‘দ্রাষ্ট্রির হট করে

দরজা খুলে বেরুবেন না কিন্তু, জায়গা ভাল নয়।’

সারাদিনের পথশ্রান্তিতে ঘুম আসতে দেরি হলো না। মাঝরাতে কিসের শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। ওরা কান পেতে শুনল, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ। এদিকে ঘোড়ার গাড়ি আগে ওদের চোখে পড়েনি। ডাকবাংলোর সামনেই এসে থামল গাড়িটা। কারা যেন গাড়ি থেকে নেমে বারান্দা দিয়ে হেঁটে ওদের পাশের ঘরেই ঢুকল। ডাকবাংলোয় ওরা ছাড়া আরও যে অতিথি আছে চৌকিদার এ কথা ওদের বলেনি।

ওরা আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল। ঘুমিয়েও পড়েছিল কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ শব্দে আবার ঘুম গেল ভেঙে। একটা দুটো নয়, যেন বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটেতে ছুটেতে এসে থামলো ডাকবাংলোর সামনে। এত ঘোড়া কেন! ওরা অবাক না হয়ে পারল না। সেই সঙ্গে কৌতূহলেও ওরা উদ্গ্রীব হয়ে উঠল।

জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাল দুজনেই। অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। জনা কয়েক গোরা ঘোড়সওয়ার ঘিরে ধরেছে একটা ঘোড়াগাড়িকে। সাধারণ ঘোড়াগাড়ি নয়, অনেকটা ফিটনের মতো দেখতে, বালরের পর্দায় ঘেরা, দুটো ঘোড়া—একটা কালো কুচকুচে অন্যটা ধবধবে সাদা। দুটোর চোখেই ঠুলি পরানো, গায়ে বহুমূল্য কিংখাব, মাথায় রূপোর তাজ। কোচোয়ানের গায়েও বলমলে পোশাক। হঠাৎ গোরাদের একজন, তার কাঁধের ওপর ধাতুর তারা দেখে বোঝা যায় একজন কর্নেল, পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করল সেই কোচোয়ানকে, আর সে বুকে হাত দিয়ে ধপ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তৌফিকের মুখ দিয়ে একটা অশ্রুট শব্দ বেরিয়ে এল। তারপরই সেই কর্নেল সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে গটগট করে এগিয়ে গেল ওদের পাশের ঘরের দিকে।

তৌফিক এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল, ওর হাত-পা কাঁপছিল, কিন্তু শাহিদের যেন কোনো চেতনা নেই। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে ও এগিয়ে চলেছে দরজার দিকে। ওর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে গেল তৌফিক। বন্ধুকে আটকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শাহিদের শরীরে যেন অসীম শক্তি এসে ভর করেছে। এক ঝটকায় তৌফিককে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ও। অগত্যা তৌফিককেও যেতে হলো তার পেছন পেছন।

পাশের ঘরের দরজার দুটো পাটই হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর বিচিত্র এক দৃশ্য চোখে পড়ল ওদের। সেই গোরা কর্নেল পিস্তল উঁচিয়ে আছে আর তার কয়েক হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন পুরুষের পোশাক পরা এক রমণী, অপূর্ব রূপসী। মণিমুক্তা-খচিত মখমলের একটা মুসলমানি টুপি মাটিতে পড়ে আছে। ওটা মাথায় থাকলে রূপবান এক পুরুষ বলেই ভুল হতো। ওদের মনে হলো মুখটা যেন খুব চেনা চেনা।

সেই রমণীর পদ্মকলির মতো দু’চোখে ফুটে উঠেছে তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক বান্দী, তার হাতে একটা বাঁকা তরোয়াল।

কর্নেল হা হা করে হাসল, তারপর ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বিদ্রূপের গলায় বলল, ‘বেগমসাহেবা, ভেবেছিলেন আমাদের ফাঁকি দিয়ে ধন-রত্ন নিয়ে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা আগেই সে খবর পেয়েছিলাম। আপনার হারেমের এক বান্দী খবরটা আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল। আমরা এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এখন ধন-রত্নের পেটিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ করুন।’

বেগমসাহেবার দু’চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়লো, তিনি বললেন, ‘ওরে বিদেশী কুকুর, তুই কি ভেবেছিস নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওই পেটিকা তোর হাতে তুলে দেব! স্পর্ধা তো কম নয়!’

কর্নেলের ফর্সা মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠল, জ্বলে উঠল দু’চোখ। ‘তবে মর তুমি’, বলে পিস্তলটা সে বেগমসাহেবার দিকে তাক করল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই বান্দী তরোয়াল নিয়ে কাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল কর্নেলের ওপর। পিস্তলের গুলিটা এসে লাগল তার বুকে। রক্তে লাল হয়ে গেল জামা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বেগমের বান্দী। শেষবারের মতো সে তাকালো বেগমসাহেবার দিকে।

কর্নেল আবার হা হা করে হেসে দু’পা এগিয়ে এল। কিন্তু সে কিছু করবার আগেই বেগমসাহেবা বিদ্রূপগতিতে কটিদেশ থেকে একটা ছোরা বার করে আমূল বসিয়ে দিলেন সেই কর্নেলের বুকে। মরণ আর্তনাদ করে উঠল কর্নেল। সেই সঙ্গে তার পিস্তলটাও গর্জে উঠল। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

স্তম্ভিত তৌফিক তাকালো শাহিদের দিকে, তারপরই চমকে উঠল। শাহিদের দু’চোখে ফুটে উঠেছে ক্রোধ আর জিঘাংসার চিহ্ন। ও বন্ধুকে কয়েকবার জোরে নাড়া দিতেই আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল শাহিদ।

এদিকে যে গোরা সেনারা ওই কর্নেলের সঙ্গে এসেছিল, দলপতির মৃত্যুতে তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় তারা কি সব পরামর্শ করল, তারপর কর্নেলের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এসে ওই ফিটনে চাপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জোর কদমে। আশ্চর্য, এত যে কাণ্ড ঘটে গেল, শাহিদের দিকে একবারও কেউ ফিরেও তাকাল না, যেন ওদের উপস্থিতি টেরই পায়নি।

ওরা চলে যাবার ঠিক পরই সেখানে এলেন কালো আলখাল্লায় ঢাকা, গলায় শূতির মালা, দীর্ঘদেহী এক ফকির সাহেব, সঙ্গে দু’জন শিষ্য। তাঁরা ঘরে গিয়ে বেগমসাহেবা আর তাঁর বান্দীর মৃতদেহ যত্ন করে বাইরে বয়ে নিয়ে এলেন। তারপর একটা গাছের তলায় পাশাপাশি সমাধিস্থ করলেন মৃতদেহ দুটি। কাজ শেষ হতে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমন হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তাঁরা।

এখন চারদিক নির্জন নিঃশব্দ। এত যে কাণ্ড ঘটে গেছে বোঝবার উপায় নেই। শাহিদ কেমন হয়ে গেছে, মুখে কথা

নেই, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে মনে হয়। তৌফিক ওকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এবার আর বাধা দিল না ও। শাহিদকে শুইয়ে তৌফিকও শুয়ে পড়ল ওর পাশে।

কখন যে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেরাই জানে না, ঘুম ভাঙল ডাকবাংলোর চৌকিদারের হাঁকডাকে। দরজা খুলতেই সে বলল, বেলা হওয়া সত্ত্বেও ওদের উঠতে না দেখে তার দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

সত্যিই অনেকক্ষণ রোদ উঠেছে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে পাহাড়ি উপত্যকা। গত রাতের ঘটনা মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন। কিন্তু সত্যিই কি তাই! ওরা দু'জন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

চৌকিদার ওদের মুখের হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করে ব্যাপার কি জানতে চাইল। তৌফিকই খুলে বলল সব কথা।

চৌকিদারের তো দু'চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। বলল, 'আমার বাপ ঠাকুরদার মুখে এমন একটা ঘটনা শুনেছি বটে, তবে সে তো অনেক বছর আগের ঘটনা। আংরেজরা এক এক করে নবাব বাদশাদের রাজ্য কেড়ে নিচ্ছিল। তখন নাকি এখানে একটা বাগানবাড়ি ছিল, এক নবাবের বাগানবাড়ি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এমন ঘটনা দেখেছে বলে শুনিনি।'

চৌকিদার ওদের সকালের জলখাবার আনতে চলে গেল। শাহিদ হঠাৎ বলে উঠল, 'ব্যাপারটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।'

'কি সেটা?' তৌফিক জিগ্যেস করল।

'যে বেগমসাহেবাকে আমরা কাল রাতে দেখেছিলাম, তাঁকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, কাল বুঝতে পারিনি। হাসান আলির অফিসে আর কলাভবনে যে ছবিটা আমরা দেখেছিলাম, সেই ফতিমা বেগমই কাল দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের বংশ শাখা-প্রশাখার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আমিও তার একটা শাখা। হয়তো খোদার মজিভেই কাল আমরা এখানে এসেছিলাম। বেগমসাহেবা সেই রাতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আমাদের জানিয়ে গেলেন আসলে কি ঘটেছিল। হয়তো এটা না জানানো পর্যন্ত তাঁর আত্মা শান্তি পাচ্ছিল না।'

একটু থেমে শাহিদ আবার বলল, 'আল্লার কাছে আমি তাঁর জন্য দোয়া মাগুব।'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য



আপনি কি হারাচ্ছেন জানেন কি ?



গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পূজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পূজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পূজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভুতুড়ে খেলোয়াড়

রবিদাস সাহারায়



মহীতোষ আর ননীলাল মীরপুর ও আশপাশের খেলার জগৎকে মাতিয়ে রেখেছে। নেতাজী একাদশের মহীতোষ আর মিলন সমিতির ননীলাল ছাড়া এই এলাকায় যেন খেলোয়াড় নেই, এই দু'জনের কথা ছাড়া কোনো কথা নেই।

মীরপুরে আছে মাত্র একটি খেলার মাঠ। স্কুলের এই মাঠটিই সবেদন নীলমণি। আধা-গ্রাম, আধা-শহর এই মীরপুর এখন ঘনবসতি অঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাঠ ও পুকুর বুজে গিয়ে তার ওপর উঠে যাচ্ছে কাঁচা পাকা নানারকম বাড়ি। তবু ঐ মাঠে খেলেই দুটি ক্লাব খুব নাম করে ফেলেছে—নেতাজী একাদশ আর মিলন সমিতি।

খেলোয়াড়দের মধ্যে মহীতোষ আইচের নামটাই একটু বেশি। তার খেলার কৌশলের প্রশংসা অনেকেই করে। কেউ কেউ বলে এককালে মহীতোষ চুনী গোস্বামী বা বলরামের মতোই খেলোয়াড় হবে।

এই প্রশংসায় হিংসায় স্বলে মরে মিলন সমিতির ননীলাল কর্মকার। সে চায় মহীতোষের মতো তারও প্রশংসা লোকের মুখে মুখে ফিরুক। মহীতোষের চাইতে সে কম কিসে? লোকে বলে মহীতোষের জনোই নেতাজী একাদশ বঙ্গশ্রী ট্রফি পরপর দুবার জিতে নিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ফাইনালে জিতেছে চারবার। ননীলাল মনে করে সে ইচ্ছে করলেই মিলন সমিতিতে এমন সম্মান এনে দিতে পারে।

এবার বঙ্গশ্রী ট্রফির ফাইনালে ওঠবার সম্ভাবনা খুব উজ্জল নেতাজী একাদশের। মিলন সমিতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মহীতোষ প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে, এবার বঙ্গশ্রী ট্রফি তারা জিতবেই। ননীলালেরও চ্যালেঞ্জ, মিলন সমিতিই এবার জিতে নেবে বঙ্গশ্রী ট্রফি। নেতাজী একাদশকে কিছুতেই হ্যাট্রিক করতে দেওয়া হবে না।

একদিন কি কুস্কণেই বাজারের পথে দেখা হয়ে গেল পাশের গাঁয়ের পিনাকী দাসের সঙ্গে ননীলালের। পিনাকী আগে মিলন সমিতির সমর্থক ছিল, কিন্তু এখন নেতাজী একাদশের ব্লাইন্ড সাপোর্টার। তাছাড়াও মহীতোষের দারুণ ভক্ত। সে খবর কী ভাবে শুনতে পেয়েছে ননীলাল। তাই সে জিজ্ঞেস করল, কিরে, তোর গুরুর খবর কি?

পিনাকী অবাক হয়ে বলল, গুরু? সে আবার কে?

ননীলাল বলল, কেন, মহীতোষ আইচ!

পিনাকী বলল, মহীতোষ আইচের মতো কোনো প্লেয়ার আছে নাকি কোনো দলে? কেমন খেলছে আজকাল, দেখেছিস? জানিস, ও ফুটবল জগতের হিরো!

পিনাকীর কথা শুনে রাগে ঝলে উঠল ননীলাল। বলল, ইস, কোথাকার 'হিরো' রে! মেরে ওকে একেবারে জিরো বানিয়ে দেবো।

পিনাকী বলল, তা পারবি বটে। কিন্তু সারা জন্ম তপস্যা করলেও মহীতোষের মতো খেলোয়াড় হতে পারবি?

ননীলাল আরও রেগে গিয়ে বলল, যা যা, চামচে কোথাকার! মহীতোষের কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ খেয়েছিস?

এই মিথ্যা অপবাদ পিনাকীর সহ্য হলো না। সে ঠাস করে ননীলালের গালে এক চড় মেরে বসল। ননীলাল চড় খেয়ে হুজুম করল না। সে সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীকে সজোরে এক ঘুষি মেরে বসল। শুরু হয়ে গেল কুকক্ষেত্র! বাজারের পথে যাতায়াতকারী কিছু মানুষ ছুটে এসে অনেক কষ্টে দু'জনকে নিরস্ত করল।

এদিকে যত দিন যেতে লাগল, ততই মীরপুরের আবহাওয়া ভারী হতে লাগল। বঙ্গশ্রী ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে নেতাজী একাদশ কোনোরকমে হারের হাত থেকে বেঁচে গেল। মহীতোষের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। আগের দিন থেকেই সে ঝরে ভুগছিল। তাই নিয়ে খেলছে। খেলা শুরুর পনেরো মিনিটের মধ্যেই নেতাজী একাদশ একটা গোল খেয়ে গেল প্রতিপক্ষ নটেপাড়ার দলের কাছে। সবাই বুঝতে পারল, মহীতোষ সুস্থ থাকলে এমন অঘটন ঘটতো না। চরম হতাশার ছায়া নেমে এল সেই দলের অনুরাগীদের ওপর। খেলার প্রথমার্ধে বিরতির সময়ে দেখা গেল মহীতোষের গায়ের উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারল, আবার ঝর আসছে মহীতোষের। সবাই বলল, মহীতোষের আজ আর খেলার দরকার নেই। বিকল্প খেলোয়াড় দাও।

মহীতোষ কিন্তু রাজী হলো না। অসুস্থ শরীর নিয়েই সে খেলতে লাগল। শরীরের উত্তাপের সঙ্গে মনের উত্তাপও বাড়তে লাগল তার। সেই উত্তাপের কি যে ছালা তা অন্য লোকের বোঝার উপায় নেই। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মহীতোষ গোলটি পরিশোধ করল। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল মাঠের দর্শক। তার পনেরো মিনিটের পরে যখন মহীতোষ আর একটি জয়সূচক গোল করল তখন দর্শকদের উচ্ছ্বাস যেন বাধা মানতে চাইল না। মহীতোষের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় গোলটি করার পরেই মহীতোষ মাঠের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো মাঠের বাইরে। বাকি সময়টা দশজন খেলোয়াড় নিয়েই খেলা হলো। নটেপাড়ার দল আর কোনো গোল করতে পারল না। নেতাজী একাদশের

বিজয় অব্যাহত রইল।

এরপর থেকে আরও বিখ্যাত হয়ে উঠল মহীতোষের নাম। বঙ্গশ্রী ট্রফির ফাইনালে উঠেছে নেতাজী একাদশ। মহীতোষ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

ওদিকে ঈর্ষার অনলে ঝলতে লাগল মিলন সমিতি। তারাও ফাইনালে উঠবে এটা নিশ্চিত। তাহলে নেতাজী একাদশের মুখোমুখি তাদের হতে হবে। মনে একটু দুশ্চিন্তা জেগে উঠলো তাদের। ফাইনালে যদি মহীতোষ খেলে তবে কিছুতেই তাদের জেতবার আশা নেই। তাদের চ্যালেঞ্জের কোনো মূল্যই তাহলে থাকবে না।

সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা ননীলালের। এখন সে সরাসরি মহীতোষের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার দল যদি হেরে যায় তা হলে গাঁয়ের লোকের সামনে সে বেকতে পারবে না। মনে মনে নানা অভিসন্ধি করতে লাগল ননীলাল। যে কোনো ভাবেই হোক ফাইনাল খেলার দিন মহীতোষকে মাঠের বাইরে রাখতে হবে।

সত্যি সত্যি ফাইনালে উঠে গেল মিলন সমিতি। ফাইনালে খেলার দিনও নির্ধারিত হয়ে গেল—পরবর্তী রবিবার। হাতে আছে মাত্র ছয়টি দিন। এর মধ্যেই সব কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ ননীলালের মনে পড়ে গেল, চার মাইল দূরে কমলগাছিতে আছে মহীতোষের মামার বাড়ি। মহীতোষের মামাকে সে ভালভাবেই চিনতো, তবু নিজে গেল না। ক্লাবের একটি ছেলেকে কমলগাছিতে পাঠাল। ছেলেটি গিয়ে মহীতোষের মামা নেপাল বিশ্বাসকে বলল, আপনার ভাগনে মহীতোষের সামনে ভয়ানক বিপদ। রবিবার দিন বঙ্গশ্রী ট্রফিতে তাকে খেলতে দেবেন না। সেদিন তাকে মারাত্মক ভাবে জখম করার চক্রান্ত হয়েছে। এখানে এনে তাকে আটকে রাখবেন। এসব বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না।

সত্য মিথ্যা নানা কথা জুড়িয়ে এমন ভাবে ছেলেটি শেখানো বুলি বলল যে, নেপাল বিশ্বাস তা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ভাগনেকে খুবই ভালবাসেন। ওর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তাই বললেন, ঠিক আছে, আমি খেলার আগেই একদিন ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব। খেলার দিন ওকে ছাড়ব না।

আশ্বাস পেয়ে ছেলেটি খুশি মনে ফিরে এল। ননীলালও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কারণ খেলার মাঠে সে যমের মতো ভয় করে মহীতোষকে। অন্যান্য দলের সঙ্গে খেলার দিন খুবই ভাল খেলে ননীলাল। কিন্তু নেতাজী একাদশের সঙ্গে খেলার দিন বল নিয়ে যখন মহীতোষ এগিয়ে আসে তখন সে কঁচোর মতো হয়ে যায়। খেলার আইন বাঁচিয়ে মাঠে ত্রাসের সৃষ্টি করতে তার মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। তার মামা যদি সত্যি খেলার দিন ছলে কৌশলে তাকে আটকে রাখতে পারে তবে বঙ্গশ্রী ট্রফি নির্যাত আসবে মিলন সমিতি ক্লাবে।

ওদিকে নেপাল বিশ্বাস খুবই ভাবনায় পড়ে গেছেন ভাগনের



রাজেন বল ঢুকিয়ে দিল গোলবারের ভিতর।

ব্যাপার নিয়ে। তিনি ফন্দি আঁটতে লাগলেন। খেলা-পাগল ছেলেকে কি খেলার দিন আটকে রাখা সম্ভব হবে? অবশেষে সব কিছু গোপন রেখে খেলার দুদিন আগে নিজেই এলেন মীরপুরে। মীরপুরের সীমানায় পা দিতেই নানারকম গুজব তাঁর কানে আসতে লাগল। মহীতোষ যদি না খেলে তাহলে বঙ্গশ্রী ট্রফি মিলন সমিতিই পাবে। আর মহীতোষের পক্ষে খেলাও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সেমিফাইনালের দিন যেভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তাতে সবাই তো ভেবেছিল, মরেই যাবে মহীতোষ।

এসব খবর জানতেন না নেপাল বিশ্বাস। শুনে তাঁর বুক টিপটিপ করতে লাগল। তিনি এগোতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এক জায়গায় এসে আচমকা থেমে গেলেন। শুনতে পেলেন একটা চায়ের দোকানে কথা হচ্ছে কয়েকজনের মধ্যে। একজন বলছে, জানিস, ফাইনাল খেলায় গোলমাল হবে খুব। মিলন সমিতি দু'জন মারকুটে খেলোয়াড় ভাড়া করে আনছে। তারা কায়দা করে খেলার মধ্যেই মহীতোষের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। বাছাধনকে জীবনে আর কোনোদিন ফুটবল খেলতে হবে না।

নেপাল বিশ্বাস এলেন মহীতোষের বাড়ি। এসে দেখলেন, মহীতোষ অসুস্থ। ক'দিন ধরে তার শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে। মহীতোষও এই সময়ে মামাকে আসতে দেখে খুব অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, মামা, আপনি হঠাৎ এলেন যে, কি ব্যাপার?

মামা বললেন, খবর খুব খারাপ মহী। তোর মামীর খুব অসুখ। বাঁচবে কিনা সন্দেহ। সব সময়ে শুধু তোর নাম করছে। তোকে দেখলে হয়তো একটু সুস্থ হতে পারে।

খবর শুনে মহীতোষ খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। এই মামী তাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছিলেন। মায়ের চেয়েও কম নন তিনি। কাজেই তাঁকে দেখতে না গেলে কিছুতেই চলবে না। অথচ আর দু'দিন পরেই বঙ্গশ্রী ট্রফির ফাইনাল খেলা।

হেতমপুর স্কুল মাঠে খেলা হবে। সেখানে গিয়ে তাকে খেলতে হবে।

মহীতোষ বলল, মামা চলো, আমি যাবো। রবিবার আর এখানে আসবো না। ওখান থেকেই চলে যাবো হেতমপুরের মাঠে। জারসিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

মামা নেপাল বিশ্বাস কোনো ব্যাপারেই আপত্তি করলেন না। ভাবলেন, আগে তো ওকে বাড়ি নিয়ে যাই, তারপর দেখা যাবে। ক্লাবের সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মহীতোষ মামার বাড়ি কমলগাছিতে রওনা হয়ে গেল। ভেবেছিল বিকেলেই রওনা হবে। কিন্তু সন্ধ্যার আগে ছাড়া কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরুনা গেল না। মাইল খানেক রাস্তা পার হবার পরই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়েই তারা এসে পৌঁছল কমলগাছিতে। রাত্রে প্রচণ্ড ঝর এলো মহীতোষের।

মহীতোষ এসে দেখল, মামীর তেমন কিছু অসুখ হয়নি। মামা বললেন, তুই আসবি বলেই হয়তো তোর মামীর শরীর একটু ভাল হয়ে গেছে। মহীতোষ মনে মনে ভাবল, অনেকদিন দেখেননি বলেই হয়তো মামীমা তাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে ভেজার ফলে নিজেই ঝরে কাবু হয়ে পড়ল।

রবিবার খুব সকালেই মীরপুর থেকে নেতাজী একাদশ ক্লাবের দু'জন ছেলে গিয়ে হাজির হলো কমলগাছিতে। তারা এসে দেখল মহীতোষের গায়ে ঝর। খুবই হতাশ হয়ে পড়ল তারা। কিন্তু মহীতোষ আশ্বাস দিয়ে বলল, তোরা বাড়ি চলে যা। ক্লাবের সবাইকে নিয়ে ঠিক সময়ে চলে যাবি হেতমপুর স্কুল মাঠে। আমি এখান থেকেই সোজা সেই মাঠে চলে যাবো। চিন্তা করবি না, আমি যাবই।

মীরপুর ফিরে এসে মহীতোষের খবর জানাতেই ক্লাবের সেক্রেটারি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘোরাঘুরি করে একজন

খেলোয়াড়কে টাকা দিয়ে বিক্রয় হিসাবে তৈরি করে রাখল। যদি মহীতোষ যেতে না পারে তবে ঐ খেলোয়াড়ই খেলবে।

মিলন সমিতির ছেলেরা খবর পেয়েছে, মহীতোষ তার মামার বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিছুতেই খেলতে পারবে না সে। কাজেই ট্রফি জয় তাদের ভাগ্যেই আছে। আনন্দের ফেয়ারা উঠল মিলন সমিতির ক্লাব ঘরে। ব্যান্ডপার্টি আনবার ব্যবস্থা চলতে লাগল। কিনে আনা হলো প্রচুর বাজি ও পটকা। বিজয় মিছিল করারও আয়োজন চলতে লাগল।

ওদিকে বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের স্বরও বাড়তে লাগল। তার মামা হেমগঞ্জ থেকে ডাক্তার নিয়ে এলেন। বেশি টাকা দেবার আশ্বাস দিয়ে বসিয়ে রাখলেন ডাক্তারকে রোগীর কাছে। ঘনঘন ওষুধ খাওয়ানো ও ইন্জেকশন দেওয়া চলতে লাগল।

মহীতোষের মনে বিশ্বাস, দুপুরের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে, খেলতে যেতে পারবে হেতমপুর স্কুলের মাঠে। কিন্তু তার সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে স্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে লাগল। বলতে লাগল, ডাক্তারবাবু, আমাকে খুব একটা কড়া ওষুধ দিন। যেন আজকের দিনটা অন্তত ভাল থাকি। রাত্রে স্বর আবার যত আসুক ক্ষতি নেই। আমাকে ভাল করে তুলুন ডাক্তারবাবু। বঙ্গপ্রী ট্রফি যে আমাদের জিততেই হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, চিন্তা নেই, ট্রফি তোমরা জিতবেই। তোমার মতো মনোবল যে দলের খেলোয়াড়ের আছে, সে দল কি না জিততে পারে?

মনের জোরেই যেন স্বর একটু কমতে লাগল মহীতোষের। সে ভাবল, নিশ্চয়ই সে খেলতে যেতে পারবে। বেলা চারটেয় খেলা আরম্ভ। এখনো যাবার সময় আছে। ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল সে। বলল, মামীমা আমার খেলার জারসিটা বের করে দাও তো।

অবাক হয়ে শান্তিবালা জিজ্ঞেস করলেন, ওমা, ওটা দিয়ে করবে কি?

আমি গায়ে দেবো। আমাকে যেতেই হবে খেলতে। নইলে যে আমাদের ক্লাবের ট্রফি জেতা হবে না। আমাকে যেতেই হবে।

পীড়াপীড়িতে শান্তিবালাকে মহীতোষের জারসিটা বের করে দিতেই হলো। তবে তিনি বুঝতে পারলেন জারসিটা গায়ে দিলেও এতটা পথ হেঁটে মহীতোষ কিছুতেই খেলার মাঠে যেতে পারবে না।

এদিকে হেতমপুরের স্কুলের মাঠে যথাসময়ে খেলা শুরু হতে চলল। মাঠের চারদিকে দর্শকের ভিড় উপচে পড়ছে। মীরপুর থেকে কোঁটীয়ে এসেছে মানুষ।

দু'দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামতে শুরু করল। মিলন সমিতির খেলোয়াড়রা আনন্দে দিশেহারা। মহীতোষ খেলতে আসেনি।

দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী সোনার কাঠি

পঞ্চাশ বছর
পরে আবার
বেরিয়েছে



লেখক তালিকায় আছেন :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কালিদাস রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবির, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, বনফুল, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, আশালতা সিংহ, সুখলতা রাও, মন্থথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জাহানআরা বেগম চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রলাল ধর, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, অশোকনাথ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

দাম : ৩৫ টাকা মাত্র



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১, বামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

নেতাজী একাদশের খেলোয়াড়দের মনে তেমন আনন্দের সাড়া নেই। তাদের এখন প্রধান ভরসা মহীতোষের বদলী খেলোয়াড় রাজেনের ওপর। কিন্তু ভরসা থাকলেও নিশ্চয়তা নেই কিছু। দু'জন মারকুটে খেলোয়াড়কে মিলন সমিতি ভাড়া করে এনেছে। কি হবে কে জানে?

ননীলাল যখন দেখল, মহীতোষ সত্যি মাঠে আসেনি, তখন তার মন অফুরন্ত খুশিতে নেচে উঠল।

বাঁশি বাজল, খেলা শুরু হলো। দশ পনেরো মিনিট কেটে গেল, তবু মাঠে কোনো উত্তেজনা নেই। সময় ক্রমশ বয়ে গেল। কোনো দলই কিন্তু গোল করতে পারল না। হাফ টাইমের বাঁশি বাজল। তাহলে কি খেলা অমীমাংসিত থেকে যাবে? কিন্তু ট্রফির ফাইনাল খেলা। সাধারণভাবে মীমাংসা না হলে ট্রাইব্রেকার হবে। তাতেও যদি না হয়, তখন হবে 'স্কাউন্ড ডেথ'। মীমাংসা করতেই হবে আজ।

মিলন সমিতির ননীলালের মারমুখো ভাবটাই আজ বেশি। কারণ তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহীতোষ নেই, তাই মরিয়া হয়ে খেলছে সে। মহীতোষের বদলী খেলোয়াড়কে আইন বাঁচিয়েই ঘায়েল করবে। ট্রফি আজ তারা জিতবেই।

দ্বিতীয়ার্ধেরও কেটে গেল বিশ মিনিট। মাঠের দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল। খেলোয়াড়দের ভেতরও জেগে উঠল তৎপরতা। মাঠের ঘাসের মাথায় হঠাৎ যেন ঝড় উঠল। ঘুরে গেল খেলার গতি। নেতাজী একাদশের বদলী খেলোয়াড় রাজেন ঘোষ প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে যেতে লাগল বল নিয়ে। তার সামনে পড়ে ননীলাল যেন কেঁচো হয়ে গেল। ছিটকে যেতে লাগল বারে বারে।

মিলন সমিতির সমর্থক দর্শকরা চিৎকার করে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করতে লাগল ননীলালকে। কিন্তু ননীলাল তাতে মোটেই উত্তেজিত হলো না। সে যেন কেমন কেঁপে উঠে ক্রমশ বিমিয়ে পড়তে লাগল। খেলার আর বাকি আছে মাত্র আট মিনিট। নেতাজী একাদশ দলের বদলী খেলোয়াড় রাজেনেরই এখন প্রাধান্য বেশি। ননীলাল বল নিয়ে এগিয়ে গেলে রাজেন সহজেই তাকে প্রতিহত করে। কিন্তু রাজেন এগিয়ে গেলে ব্যর্থ হয় ননীলাল। একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে সরে যায়। মাঠের দর্শকদের মধ্যে চোঁচামেচি হৈচৈ বাড়তে থাকে।

হারি আপ ননীলাল! চীয়ার আপ ননীলাল!!

ননীলালের যেন কি হয়েছে আজ। রাজেন এগিয়ে এলেই সে ভয় পেয়ে সরে যায়। বল আটকাবে কি, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায় সে। ওর হলো কি! ভূতে ধরেছে নাকি ননীলালকে?

খেলার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে। মাঠময় উত্তেজনা। এমনসময় এক অঘটন ঘটে গেল। নেতাজী একাদশ দলের রাজেন বল ঢুকিয়ে দিল মিলন সমিতির গোল বারের ভিতর।

উত্তেজনা এবার ফেটে পড়ল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল নেতাজী একাদশের সমর্থকরা। ননীলালের অবস্থা ভিজে

বেড়ালের মতো। ধীরে ধীরে চুপসে যাচ্ছে সে।

মিনিট দুয়েক থমকে থাকার পর আবার খেলা চলতে লাগল বিপুল বেগে। গোল পরিশোধের জন্য মিলন সমিতির খেলোয়াড়দের কি ব্যাকুল প্রচেষ্টা! এই বুঝি গোল হয়, এই বুঝি হয় গোল! শোধ-বোধ হয়ে যাবে এবার।

কিন্তু কি আশ্চর্য! খেলা শেষ হবার এক মিনিট আগে আর একটি বল ঢুকে গেল মিলন সমিতির গোল বারের মধ্যে। পরপর দুটি গোল। সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল মিলন সমিতির। সেই সঙ্গে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। ননীলাল কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটির ওপর। আর রাজেন বলটা বিপক্ষ দলের গোলবারের ভিতর ঢুকিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কি হলো! কি হলো! এমন ঘটনা তো খেলার মাঠে কোনোদিন ঘটেনি! কিছু বুঝতে না বুঝতেই খেলা শেষের বাঁশি বেজে উঠল।

খেলা শেষ। দু'দলের দুই অসুস্থ খেলোয়াড়কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল মাঠের চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

খেলার রহস্য জানা গেল সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই। কমলগাছি গ্রাম থেকে মহীতোষের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছল। বিজয়লাভের উল্লাস-উৎসবে মেতেছিল নেতাজী একাদশ। তা বন্ধ হয়ে গেল। মহীতোষের মরদেহ ক্লাবে নিয়ে আসার জন্য কমলগাছির দিকে রওনা হয়ে গেল একদল লোক।

জানা গেল, বিকেল পাঁচটা বাজবার কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে মহীতোষ। জারসি গায়ে দিয়েছিল বেলা তিনটে থেকেই। খেলার মাঠে যাবার জন্য ছুটফট করছিল। 'গোল' 'গোল' বলে চিৎকার করেই নাকি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

ননীলাল যা বলল তা আরও আশ্চর্যজনক। সে বলল, খেলা শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছিলাম মাঠে বল নিয়ে ছুটছে রাজেন নয়, মহীতোষ। দু'টি গোলই মহীতোষ দিয়েছে। আমি তাই ভয়ে ও হতাশায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম।

মহীতোষের বদলী খেলোয়াড় রাজেন বলল, খেলার শেষদিকে আমার কোনো হুঁশই ছিল না। কে যেন ভর করেছিল আমার ওপরে। সে-ই আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শেষ সময়ে ধকল সহ্য করতে না পেরে আমি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। খেলায় কি হয়েছে আমি তা জানি না।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অপূর্ব কৌশলে দলকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল মহীতোষ, না তার প্রেতাত্মা?



দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

এখন তো গরমের সেই কষ্ট আর নেই। আকাশে মেঘ, বাতাসে জলো ভাব। তার ওপর আবার টাপুর-টুপুর বৃষ্টি। এই সময়ই তো ভূতের গল্প পড়ার মজা। তাই শুকতারার অমায়িক মাসটি বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা। কেমন লাগে জানিও। ও হ্যাঁ! বৈশাখের গোয়েন্দা সংখ্যা কেমন লেগেছে ?

তোমরা অনেকেই লিখছো আজকাল আর গল্প বলি না কেন! জায়গা কোথায় বলো! তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে দিতেই তো জায়গা শেষ। তা তোমরা গল্প শোনার আবদার করলে দাদুমণি কি আর চুপ করে থাকতে পারে! এসো তোমাদের একটা গল্প বলি।

অনেকদিন আগের কথা। অসমে অহম রাজা চক্রপাণি তখন রাজত্ব করতেন। রাজা ছিলেন তীষণ অহংকারী। কাউকে মানতেন না, কারো কথা শুনতেন না। ঠাকুর-দেবতায় তাঁর বিশ্বাস নেই। এমন কি দেবী কামাখ্যাকেও তিনি মানতেন না। মন্ত্রী ছিলেন খুব ভালো। রাজাকে ভালোওবাসতেন তিনি। সব সময় তিনি রাজাকে চোখে চোখে রাখতেন। আর বলতেন, দেবী কামাখ্যাকে অন্তত বিশ্বাস করতে। তাঁর পূজা করতে। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা হাসতেন। বলতেন, দেবী কামাখ্যাকে তিনি ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দেবেন। রাজার কথা শুনে মন্ত্রী শিউরে উঠতেন। হাতজোড় করে দেবীর কাছে রাজার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

রাজার ছিলো শিকার করার খুব শখ। লোকজন নিয়ে তিনি প্রায়ই শিকারে যেতেন। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীকেও থাকতে হতো। তা সেবার শিকারে যাবার আগে মন্ত্রী বললেন, রাজামশাই, শিকারে যাবার আগে দেবী কামাখ্যার পূজা দিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে বিপদ হতে পারে।

কিসের বিপদ? আমি রাজা, আমার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত থাকবে। তোমার ঐ দেবীকে এবার জলে ভাসিয়ে দেবো। চলো চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রাজা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুর কাছে গভীর ক্ষত হলো। মন্ত্রী বললেন, রাজামশাই, শিকারে গিয়ে কাজ নেই। ভগবান যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন।

রাজা বিরক্ত হয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এতেটা পা কেটে গেলো, এতে মঙ্গলটা কোথায় দেখলে? মন্ত্রীর ওপর রেগে গিয়ে রাজা ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মন্ত্রী চললেন তাঁর শেহন শেহন। গভীর জঙ্গলে গিয়ে রাজা হঠাৎ দলছুট হয়ে গেলেন। মন্ত্রী কিন্তু তাঁর সঙ্গেই আছেন। খাবার নেই, জল নেই, বিরক্ত রাজা দেবী কামাখ্যাকে গালাগাল দিতে লড়াইলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন এবার ফিরে গিয়ে তিনি দেবী কামাখ্যাকে জলে ভাসিয়ে দেবেনই। কিন্তু মন্ত্রীকে চূপচাপ থাকতে দেখে রাজা বললেন, আপনি কেমন ধারা মানুষ? এতো কষ্টেও মুখটি বুঁজে আছেন!

মন্ত্রী হেসে বললেন, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা আরও রেগে গেলেন। মুখে কিছু বললেন না। সেই সময় দূরে একটা কুমোর ওপর তাঁর চোখ পড়লো। দুটু বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। মন্ত্রীকে বললেন, দেখো তো গিয়ে ঐ কুমোরে জল আছে কিনা!

মন্ত্রী গিয়ে যেই বুঁকে দেখেছেন কুমোর জল আছে কিনা অমনি রাজা তাঁকে ঠেলে কুমোর মধ্যে ফেলে দিলেন। বললেন, দেখি কোন ঠাকুর তোমায় বাঁচায়। মন্ত্রী পড়ে যেতে যেতে বললেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়। যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

তা কুমোর জল ছিলো না। নরম কাদায় পড়ায় তাঁর চোট-টোট লাগলো না। একা রাজা দিশাহারার মতো জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে একদল ডাকাতের হাতে পড়লেন। ডাকাতসর্দার বললো, চল একে ডেরায় নিয়ে যাই। মারের কাছে বলি দিয়ে আমরা ডাকাতি করতে বেকবো।

তাই শুনে রাজার তো হয়ে গেছে। তিনি ভয়ে কাঁপছেন। আর কোনো উপায় না দেখে তিনি দেবী কামাখ্যাকেই ডাকতে শুরু করলেন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। ওদিকে ডাকাতরা পুজোর তোড়জোড় করছে। হাঁড়িকাঠ জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে। বাঁড়া বেঁধে করা হয়েছে। ডাকাতসর্দার পুজোর বসার আগে রাজাকে দেবীর কাছে বলি দেওয়া হবে বলে উৎসর্গ করলো। তারপর বললো, যাও একে স্নান করিয়ে আনো। অন্য ডাকাতরা রাজাকে স্নান করিয়ে কৌশিন পরিবে এনে হাজির করলো। রাজা তখন প্রাণভয়ে দেবী কামাখ্যাকে ভেঁকে চলছেন। হঠাৎ ডাকাতসর্দারের চোখ পড়লো রাজার পায়ের ক্ষতের ওপর। সর্দার চমকে উঠে বললো, এর শরীরে খুঁত আছে। দেবীর কাছে একে বলি দেওয়া যাবে না। যাও একে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো।

একজন ডাকাত বললো, তার চেয়ে বরং এর গলাটা কেটে ফেলি।

সর্দার বললো, তা হয় না। দেবীর কাছে উৎসর্গ করা বলিকে হত্যা করতে নেই।

ডাকাতরা তখন রাজাকে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো। রাজারও তখন ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস জন্মেছে। তিনি লোকজন নিয়ে চললেন মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে। কুমোর মধ্যে বসেছিলেন মন্ত্রী। তাঁকে ওপরে তোলা হলো। রাজা তাঁকে সব বলে জিজ্ঞেস করলেন, ঈশ্বর যা করেন তা যদি মঙ্গলের জন্যে করেন তাহলে আপনাকে আমায় দিয়ে কুমোর মধ্যে ফেলবেন কেন?

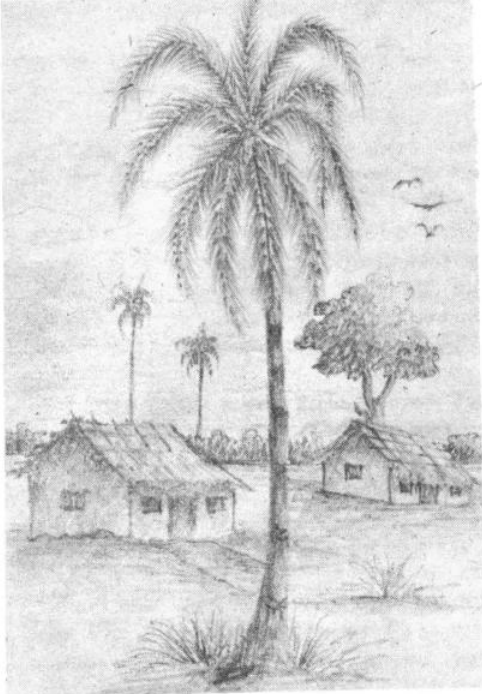
বুঝলেন না রাজামশাই। আপনার শরীরে ক্ষত দেখে ডাকাতরা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় নিয়ে পড়তো। আমার শরীরে তো কোনো ক্ষত-টত নেই। ওরা আমাকেই বলি দিতো। তাই তো ঈশ্বর আপনার হাত দিয়েই আমায় বাঁচালেন!

কেমন লাগলো? জানিও কিন্তু। এ মাসে আর তোমাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হলো না। আসছে মাসে দেবো। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ!

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা



কৌশিক মল্লিক, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী, কে. কে. হিন্দু একাডেমী, দমদম

মুক্তি

১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে ভারতের জয় হলো ঠিকই, কিন্তু বন্দী হলো বেশ কিছু ভারতীয় সৈনিক। প্রায় চোদ্দ-পনের বছর পর দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিতে ঠিক হলো, উভয় দেশের যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হলোও তাই।

সৌরাজ নামে এক ভারতীয় যুদ্ধবন্দী মুক্তি পেয়ে ভারতের মাটিতে পা রেখে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। প্রথমে সে দেশের মাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল, তারপর পরম যত্নে তা পকেটে রেখে দিল। দেশের মাটি তুলতে তুলতে সে গলা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' গানটি গাইতে শুরু করল।

কিছুদূর গিয়ে সৌরাজ দেখল এক জায়গায় খুব ভিড়। কৌতূহলী সৌরাজ আর তার সঙ্গী সুনীল সেখানে গিয়ে দেখল একজন লোক নানা রঙের সুন্দর সুন্দর সব পাখি বিক্রি করছে। সৌরাজ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনি কি এই পাখিগুলো বিক্রি করবেন?' লোকটা বলল, 'নিশ্চয়ই বিক্রি করব। এরা হচ্ছে ভাল জাতের পাখি। কোথাও এরকম পাবেন না, যা শেখাবেন তাই শিখবে, যা করাবেন তাই করবে।' সৌরাজ পাখিগুলো

কিনতে গেল, বাধা দিল সুনীল, বলল, 'তুই কি পাগল হয়েছিস? এতগুলো পাখি কিনবি! যদি নিতেই হয় তবে এই পাখিটা নিয়ে যা।' বলে সে একটা পাখির দিকে আঙুল তুলল। সৌরাজ অশ্রুপ করল না। এতদিন সে বন্দী অবস্থায় ছিল। তার কাছে পয়সা-কড়ি নেই। অগত্যা একমাত্র সম্ভব ঘড়িটি লোকটাকে দিয়ে তার বিনিময়ে সমস্ত পাখি সে কিনে ফেলল।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড করল সৌরাজ। একটার পর একটা খাঁচার দরজা খুলে দিল। মুক্তি পেয়ে পাখিগুলোও আকাশে উড়ে গেল। সবাই হাঁ করে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পাখি-বিক্রেতা চিৎকার করে উঠল, 'ও মশাই, একি করছেন! পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিলেন কেন? এই রকম জাতের পাখি আর কোনোদিন পাবেন না।' সুনীল বলল, 'একি করছিস সৌরাজ, ঘড়ির বদলে পাখিগুলো কিনলি, তাও আবার উড়িয়ে দিলি!' সৌরাজ সুনীলকে বলল, 'তোকে নতুন করে কিছুই বলার নেই সুনীল। বন্দী অবস্থায় থাকার দুঃখ তুই তো জানিস। আজ এই পাখিগুলোকে দেখে আমার ঐ বিভীষিকাময় জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। তাই ওদের মুক্তি দিয়ে দিলাম। আজ আমি দারুণ খুশী রে সুনীল, দারুণ। মনে হচ্ছে আজ আমার সত্যিই মুক্তি হয়েছে।

রাকেশ দেব, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী, বিরাট হাই স্কুল, কলকাতা

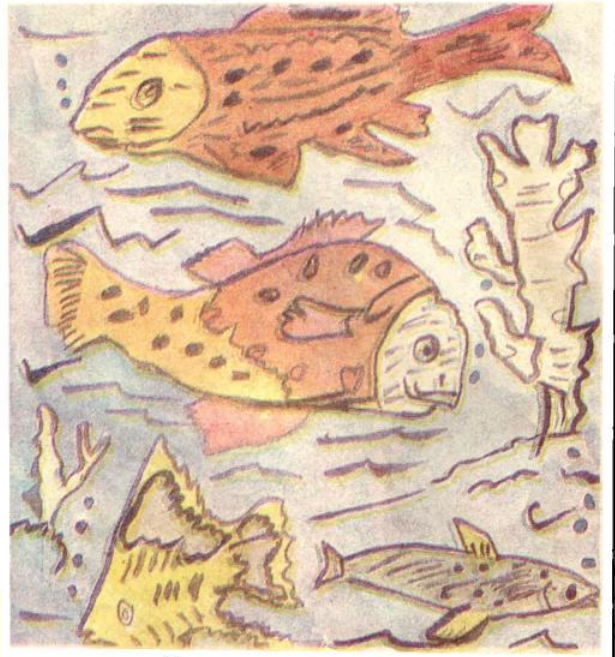
ওরাও মানুষ

দিনরাত রাস্তায় পড়ে আছে যারা
মানুষ কি নয় ওগো তারা?
তাদেরও আছে মাতাপিতা
তাদেরও আছে ভালো লাগা
তবে কেন হীন শরীরে রক্ষ চূলে
বঁচে আছে তারা?
আমরা যখন খেতে পারি না কিছু
ফেলে দিই বাড়ির পিছু
ওরা তখন লোকের দ্বারে দ্বারে
বলে, বাবু ভিক্ষে দিন কিছু।

পৃথ্বী সিংহ বিশ্বাস,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
জয়দেব রোড উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
দুর্গাপুর



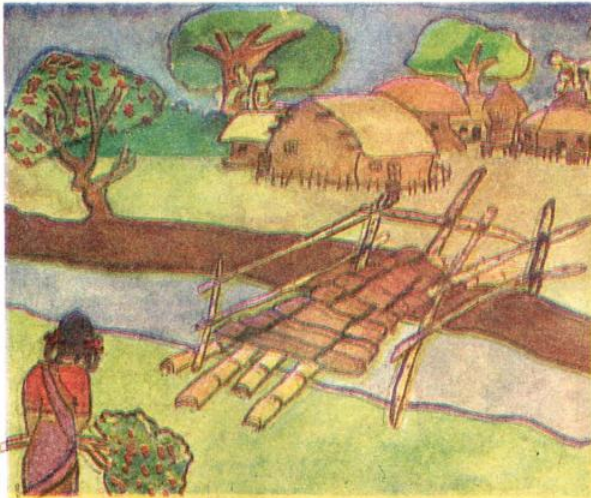
শ্রীমন্ত শুব,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, সবুজ কলাগ সঙ্ঘ বিদ্যালয়, জামশেদপুর



শুভদীপ বোস,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, সেন্ট জোসেফস স্কুল, কলকাতা

ঝড়

বৈশাখ মাসের বিকেল বেলায় এলো ভীষণ ঝড়, আকাশ ঘিরে কালো মেঘ ডাকছে কড়কড়। আকাশ কাঁপে বাতাস কাঁপে কাঁপে নদীর জল, আমের বনে পাতার ছেলে করছে কোলাহল। বাকু মিয়া, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী, নগর আজিজা হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ	আকাশ কোলে উড়িয়ে নিল মোমেনা বুড়ির চালা, হীরা-কাকা ঘরে ফেরে দোকানে দিয়ে তালা। ঝড়ের ভয়ে প্রাণটি আমার কাঁপছে দুরু দুরু, মাঠের পারে পিয়াল বনে প্রলয় হলো শুরু।
--	--



রুচিরা মিত্র, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, কমলা গার্লস স্কুল, কলকাতা



সঙ্কিতা ঘোষ,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, শিবদাস সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল, বৈদ্যনাথ, বিষ্ণুপুর



সিন্দারাদের দুঃসাহসিক অভিযান

পদ্ম গুপ্ত • দেল গুপ্ত
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)





বুঢ়া পীরের দয়ায়

মুস্তাফা নাশাদ

একটু বেলা হতেই, বনের আগুনের মতো খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে-শোনে সেই অবাক হয়। বিশ্বাস করবে কি করবে না, দোটানায় পড়ে যায়। আর সন্দেহ ও ভক্তি মেশানো দৃষ্টিতে বুঢ়া পীরের ভাঙা সমাধির

দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে প্রণাম ও সালাম জানায়।

কিংবদন্তীর মতো এ তল্লাটে কথাটা চালু ছিল যে বুঢ়া পীর খুবই জাগ্রত। ভক্তি ভরে তাঁকে ডাকলে, দেখা পাওয়া যায়। মুশকিল আসান হয়। বহু লোকে তাঁকে বহু ব্যাপারে ডেকেছিল। কিন্তু কেউই তাঁর দেখা পায়নি কোনো দিনও। তাই সবাই ধরে নিয়েছিল যে তাঁর সম্পর্কে এ্যাদিন তারা যা শুনেছে তা কোনোটাই সত্য নয়। অন্ধবিশ্বাসের রটনাই সব। তা না হলে একটা প্রমাণও তো মিলতো? তা যখন আজ পর্যন্ত মেলেনি, তখন আর ও



নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সবাই যখন বুঢ়া গীরকে ভুলতে বসেছে, ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

রোজকার মতো সেদিনও যে যার কাজে যাবার তোড়জোড় করছিল, ঠিক সেই সময় লোককে জানান দিয়ে গ্রামে ঢুকল বাঘজোয়ার হাবাগ মণ্ডলের নাতি পরাগ মণ্ডল। কুড়ি পঁচিশজন লোকের মাথায় ফল-মূল ও দই মিষ্টির হাঁড়ি-চুবড়ি রয়েছে। সামনে পিছনে নামী-বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে। মুহূর্হু বাজি ফাটছে আর ভক্তিতে হাত জোড় করে চোখ বুজে সবার আগে-ভাগে এগিয়ে চলেছে পরাগ।

গ্রামের মোড়ল অশীতিপর হাজি জামাল সাহেবের বৈঠকখানার কাছে এসে সবাই থামল। নানা লোকের শোরগোল ও ছেলে পিলেদের চোঁচামেচি শুনে অন্দরমহল থেকে বেরলেন হাজি সাহেব। চুল, দাড়ি, ভুরু—সবই শন সফেদ। মাথায় ফেজ টুপি। এক হাতে তসবি দানা, অন্য হাতে লাঠি। বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন অবিশি। তবে দেখলে কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে হাজি সাহেব লম্বায় ছ-ফুটেরও বেশি এবং সুদূর আফগানিস্তান থেকেই যে একদা তাঁর পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

‘কী ব্যাপার বলো তো? এত চোঁচামেচি কিসের?’ হাজি সাহেব ভরাট গলায় জিগ্যোস করলেন।

‘আলতাফ আফগানী নামে একজন লোকের খোঁজে এসেছেন এঁরা।’ ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন হাজি সাহেবের উদ্দেশে বললে, ‘আমরা তো ঐ নামের কোনও লোককেই জানি না। তাই আপনার কাছে এঁদের নিয়ে এলাম।’

হাজি সাহেব তার কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর যে লোকটি আলতাফ আফগানীর খোঁজে এসেছিল তাকে জিগ্যোস করলেন, ‘তুমি তাঁর নাম জানলে কি করে?’

‘গতকাল রাত্তিরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এবং তাঁরই দমায় আমি প্রাণে বেঁচে গেছি হুজুর!’

‘কীভাবে?’ হাজি সাহেব আরামকেন্দারায় বসে আলবোলায় একটা সুখটান দিয়ে ফের জিগ্যোস করলেন। উত্তরে লোকটি হাজি সাহেবের পায়ের কাছে বসে গতকাল রাত্তিরের সমস্ত ঘটনা একের পর এক সবিস্তারে বলতে শুরু করল। সবাই উৎসুক হয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

‘দুপুরের পর থেকেই আকাশের হাব-ভাব খুব একটা ভাল মনে হচ্ছিল না। গোমড়া মুখ। থমথমে ভাব। মাঝেমাঝে দমকা বাতাস বইছিল। সন্ধ্যা না হতেই লোকজন যে যার বাড়ি ফিরতে শুরু করল। দেখতে দেখতে গঞ্জের হাট ফাঁকা হয়ে গেল। আমিও মুদিখানা বন্ধ করে ঘাটের দিকে ছুটলাম। বাতাসের শোর একটু একটু করে তখন ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। ঝড় ওঠার পূর্বাভাস। ঘাটে গিয়ে দেখলাম, নদী খুবই অশান্ত। ঢেউগুলো সব

আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে। আর তীরের দিকে আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসছে। একটাও নৌকা নেই! আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে নৌকাগুলো বেলা থাকতে থাকতে ছেড়ে গিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ। সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে ভয়ে শিউরে উঠলাম....’ বলতে বলতে লোকটা থামল। জিত দিয়ে চোঁচটা ভিজোবার চেষ্টা করে বললে, ‘একটু জল খাওয়াবেন হাজি সাহেব?’

‘কেন খাওয়াব না বাবা? তুমি যে আমার মুশকিল আসান করতে এসেছ আজ!’ হাজি সাহেবের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভরাট গলায় হাঁক পাড়লেন, ‘ওরে কেলো, এক গ্রাস বাদামের শরবত নিয়ে আয় চটপট। আর শোন, গোলাপ জল ও জামরান দিতে ভুলিস না যেন।’

হাজি সাহেবের কথা শেষ না হতে হতে ভিতর থেকে ভূতা বেলোয়ারী গ্রাসে বাদামের শরবত নিয়ে এল। লোকটা ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে শরবতটুকু গলায় ঢেলে আবার বলতে শুরু করল—

‘কি যে করি ভাবছি। বাড়ি ফেরা খুবই দরকার। বাড়িতে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনও চতুর্থ ব্যক্তি নেই। এদিকে নন্দী ডাকাত সারা অঞ্চল কাঁপিয়ে ডাকাতি করতে শুরু করেছে। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি নিয়ে যে রেহাই দেবে, তা নয় কিন্তু। প্রাণে না মারলে ওর তৃপ্তি হয় না! তাই রাত্তির হলেই যে-যার বাড়ি ঘর ছেড়ে, বনে গিয়ে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচায়। আবার সকাল হলে যে-যার বাড়ি ফেরে। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা যায় যাক, পৈতৃক প্রাণটা তো বাঁচবে!

খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি। চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠছে অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ। এমন সময় ঝড় উঠল। আরিকবাস, সে কি ঝড়! যেন শিবের তাণ্ডব নৃত্য! তার পরই নামল বৃষ্টি মুষলধারে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছুটে গেলাম পরিত্যক্ত হুঁট ভাটার শ্রমিকদের অস্থায়ী চলাঘরের দিকে। ঘরের কাছ বরাবর গিয়ে ভূত দেখার মতো অবস্থা হলো আমার। ঘরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে দলবল সমেত বসে রয়েছে নন্দী ডাকাত! প্রাণ বাঁচাতে আবার ছুটলাম খেয়াঘাটের দিকে। শিকারকে নাগালের মধ্যে এসে আবার পালাতে দেখে তারা রে-রে করে আমার পিছু নিল। ঘাটে পৌঁছে দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও ভৃত্যকে নিয়ে নৌকার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে আমি কাতরস্বরে বললাম, “দয়া করে আমাকে বাঁচান।”

“কোনও ভয় নেই! কী হয়েছে বল তো বাপু?” ভদ্রলোক আমাকে অভয় দিয়ে জিগ্যোস করলেন।

“নন্দী ডাকাত আমার পিছু নিয়েছে! এক্ষুণি এসে পড়ল বলে।” আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, “আপনারা জানেন না, ও ঝড় নিষ্ঠুর! রক্তপিপাসু!”

“তাই নাকি!” ভদ্রলোক নির্লিপ্ত ভাবে তচ্ছিন্নতার সুরে



তুমি তাঁর নাম জানলে কি করে?

বললেন।

একটু পরেই নন্দী ডাকাত তার দলবল নিয়ে হস্তদস্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। তার দু-চোখে আগুন ঝরছে। হাঁপাচ্ছে, আর ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলছে। ক্রোধে ফেটে পড়ে সে বললে, “ওবে নচ্ছার! আমার হাত থেকে পালিয়ে যাবি কোথায়?” বলেই খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল। আমি তখন প্রাণ-ভয়ে বলির পাঁঠার মতো ঠক-ঠক করে কাঁপছি। মুখে কোনও কথা সরছে না। ভদ্রলোকটির দিকে সাহায্যের জন্য করুণভাবে তাকিয়ে রইলাম।

“ওকে ছেড়ে দাও। নইলে ভাল হবে না।” ভদ্রলোক শান্ত ভাবে বললেন। নন্দী ডাকাতকে তিনি কোনও আমলই দিলেন না।

“বটে! ছেড়ে দাও বললেই ছেড়ে দিতে হবে?” নন্দী ডাকাত মুখ ভেঙেচে বললে, “তোর কথায়! কে রে তুই?”

“তোর যম!” ভদ্রলোক দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘৃণাভরে বললেন,

“যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, তাহলে ওকে ছেড়ে দিয়ে এই বেলা মানে-মানে কেটে পড়।”

“তবে রে ব্যাটা,” বলেই নন্দী ডাকাত ভদ্রলোকের ঘাড়ের রামদা দিয়ে মারল এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল আকাশের দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! দেহ থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ল না! শূন্যে কয়েক মিনিট ভেসে রইল। তারপর বনবন করে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে একসময় ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে এসে পড়ল। আপনা থেকে খুঁট করে জোড়া লেগে গেল মাথাটা! আর...আর সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে ডাকাত নন্দীর চালাচামুণ্ডেরা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে যেদিকে পারল মারল দৌড়।

“চাঁদুরে, কেমন দেখলে খেল?” ভদ্রলোক নন্দী ডাকাতের ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিয়ে জিগ্যাস করলেন।

“ঘাট মানছি ওস্তাদ। ক্ষ্যামা দাও।” নন্দী ডাকাত ভিজ়ে বেড়ালের মতো মিউ-মিউ করে বললে, “তোমার তুলনা তুমিই শুরু!”

“সেটি হবে না বাছ্যন!” ভদ্রলোক গভীরভাবে বললেন।

“কেন শুরু?” নন্দী ডাকাত তার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে জিগ্যাস করল।

“ভূত কূলেও যে আজ পাত্রে বড়ই অভাব!” ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “মনের মতো তো দূরের কথা, চলন-সইও একটাও মেলে না!” বলেই নন্দী ডাকাতের ঘাড়টা মটকে দিলেন। তারপর সঙ্গে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, “একেই বড়জামাই করগে গিন্নি। ঝাঁদির সঙ্গে বেশ মানাবে! যা দশাসই তাগড়াই চেহারা ব্যাটার! আমি মেজজামাই যোগাড় করে একটু পরেই ফিরছি।” ভদ্রলোক তাঁর কথা শেষ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি ভয়ে বেহঁশ হয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে থামল পরাণ মণ্ডল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছল। উৎসুক গ্রামবাসীরা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। সবাই চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। সূচ পড়লেও শব্দ হয় অবস্থা। পরাণ মণ্ডল আবার বলতে শুরু করল—

‘যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি যে কারা আমাকে খাসপুরের বাজ-পড়া ন্যাড়া নারকেল গাছটার মাথায় তুলে দিয়েছে। প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে। আর গাছটা ঝড়ের দাপটে মাতালের মতো একবারেই দিক দিকে হেলে পড়ছে তো পরমুহূর্তেই আবার বাঁ দিকে। প্রাণ হারাবার ভয়ে ছিনে জোঁকের মতো গাছটাকে আমি আঁকড়ে ধরে রয়েছি। কারণ, পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। চোখ বুজে গাছটাকে জাপটে ধরে রইলাম। এমন সময় অস্পষ্টভাবে শুনেতে পেলাম, কারা যেন গাছের তলায় চাপা স্বরে ফিসফাস করে কথা বলছে।

“খাঁদির তো না হয় একটা হিল্লো হলো। বুঁটির কি হবে এখন?”

“ছাড়া যখন পেয়েছি একবার, তখন বুঁটিরও একটা ব্যবস্থা করব গিমি! একটু সবুজ কর। গাছে তো ব্যাটাকে হাওয়া খেতে তুলিনি। গাছ থেকে পড়লেই নির্ঘাৎ মারা যাবে। আর এভাবে মারা যাওয়া মানেই অপঘাতে মৃত্যু হওয়া। তখন ওকে মেজজামাই করায় কোনো বাধাই আর থাকবে না। কী বুঝলে?”

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। কেন আমাকে নন্দী ডাকাতের হাত থেকে বাঁচান হলো। আর কেনই বা আমাকে গাছে তোলা হলো? নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি খোয়াঘাটের সেই ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দু’জনেই কক্ষণভাবে তাকিয়ে রয়েছেন ন্যাড়া নারকেল গাছটার দিকে। যেন এটা নারকেল গাছ নয়, জামাই গাছ! আর গাছটা থেকে নারকেলের পরিবর্তে আস্ত একটা করে জামাই পড়বে ধূপ-ধাপ করে। আর তাই কুড়িয়ে তারা ধন্য হবে। কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবে। এমন যখন অবস্থা ঠিক সেই সময় ঘোঁয়াটে আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মসজিদের ভিতর থেকে আলখাল্লা পরা এক বুঢ়া পীরবাবা বেরিয়ে আসছেন। তাঁর একমুখ সাদা শনের মতো দাড়ি। মাথায় কাশফুলের মতো একরাশ সাদা চুল। ললাটের মাঝখানে আধুলির মতো কালো উজ্জ্বল দাগ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নুরানী চিহ্ন! তাঁর এক হাতে তসবি দানা অন্য হাতে লাঠি। পায়ে খড়ম।

পীরবাবা খড়মে খট-খট শব্দ তুলে ক্রমে গাছটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁকে গাছের দিকে এগোতে দেখে ভয়ে তেনাদের মুখ শুকিয়ে চুন। ভদ্রলোক গিমির উদ্দেশে বললেন, “বাঁচতে যদি চাও তো এই বেলা পালাও গিমি। ধরা পড়লে পীরবাবা আবার বোতল বন্দী করবেন।” কথা শেষ, দু’জনেই কর্পূরের মতো কোথায় যে উবে গেল তা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

এদিকে পীরবাবা হাঁটতে হাঁটতে একেবারে গাছের কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, “কে রে তুই? রাত দুপুরে গাছের মাথায় কেন?”

উত্তরে আমি কেঁদে কেটে তাঁকে সব বললাম। তিনি আমার কথা শুনে স্থিত হেসে বললেন, “খরবিশের (ভূতের) পাল্লায় পড়েছিলে। অল্পের জন্য খুব বাঁচান বেঁচে গেছ। নিচে নেমে এসো।”

“কিস্ত....” আমি ইতস্তত করে বললাম।

“ঐ খরবিশের কথা ভাবছ?” তিনি আমায় অভয় দিয়ে বললেন, “ওরা পালিয়ে বেঁচেছে। আলতাফ আফগানীকে ডরায় না, এমন জিন, ভূত এ তল্লাটে নেই!”

“ন না, মানে....” আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, “এই তিন তলা সমান নারকেল গাছ থেকে নামি কি করে বলুন তো? এ গাছে ওঠা-নামার নিয়ম তো আমি কিছুই জানিনে হজুর। ঝাঁপ দিলে যে বেঘোরে মারা পড়ব!”

আমার কথা শুনে দরাজ গলায় তিনি হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, “বোকা ছেলের কথা শোনো। তিন তলা সমান উঁচু গাছ! আরে, ওটা তো একটা চারা নারকেল গাছ! চোখ খুলে একবার ভালভাবে তাকিয়েই দেখ না।”

তাঁর কথা শুনে তাকিয়ে দেখি, সত্যি তো! তিন-চার ফুটের একটা চারা নারকেল গাছ আর তারই মাথায় আমি বসে রয়েছি।

গাছ থেকে নেমে আমি পীরবাবার পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি আমার মাথায় সরেহে হাত বুলাতে লাগলেন। কলমা পড়ে সারা গায়ে ফুঁ দিতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশে জমা দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। দেহ মন ভরে গেল এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে। আর...আর আমার দুই চোখে নামল ঘুমের ঢল। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

‘তার পর?’ সমস্বরে উৎসুক গ্রামবাসী জিগ্যেস করল।

‘তারপর যখন আমার ঘুম ভাঙল, ঘোর কাটল, তখন চোখ মেলে দেখি, কোথায় পীরবাবা! কোথায় কে? বাড়ির উঠানে আমি শুয়ে রয়েছি। ঘামে সারা শরীর সপসপ করছে। আর উৎকণ্ঠায় আমার দিকে সজল চোখে চেয়ে রয়েছে আমার বউ, ছেলে-মেয়ে আর পাড়াপড়শিরা।’

চুপ করল পরাণ মণ্ডল। ভক্তি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে চোখ বুজে বসে রইল। হাজিসাহেবের বৈঠকখানায় তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই নির্বাক, অনড়। হাজিসাহেবের দু’গাল বেয়ে গড়াচ্ছে আনন্দাশ্রু। সমস্ত সন্দেহ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ—সব আজ ধুয়ে মুছে গেল। হাজিসাহেব অশ্রুতে বললেন, “উনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। মসজিদের ডান পাশে যে ভাঙা সমাধিটা দেখছ, ওটাই ওঁর। আজ ওঁর একশো তেত্রিশতম জন্মবার্ষিকী!”



ছবি : শিবশংকর ভট্টাচার্য

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেন এক্স (জ্যেষ্ঠ সংখ্যার পর)



জার্মানরা বখা দেবার চেষ্টা করলো না। বরখ আর তার ড্রাইভার ছাড়া অন্য নৈন্যদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেধে ফেললো।

তোমাদের কার্তুজগুলো ফাকা। আমাদের বন্ধুরা ওগুলো বদলে দিয়েছে। ভয় পেও না। আমাদের কিছু কাজ তোমাদের করে দিতে হবে।



মুক্তিযোদ্ধার নেতা তার বাছাই করা কিছু যোদ্ধাকে নিয়ে ট্রাকে উঠলো। তীত বরখের কাছ থেকে পাসওয়ার্ড জেনে নিলো। তারপর সেজা চলে গেলো খালের ধারে। সেখানে মেশিনগুলো বোটে তুলে দেওয়া হলো ব্রিটেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

সেদিন বিকেলে একজন উচ্চপদস্থ জার্মান অফিসার সেই গ্রামে এলেন নাৎসি বাহিনীর কাজকর্ম দেখতে।

সার্জেট বরখ? উনি এখানে নেই ম্যাননীয় মেজর জেনারেল। বিশেষ কাজে উনি হেড কোয়ার্টারে গেছেন।

এ যে স্যার...ই তো সার্জেট বরখ...কিন্তু...কিন্তু...এ কী!





অরণ্যপতি টারজান



সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা অট্টহাসির গররা এইমাত্র থামলো সবে, হঠাৎ টারজানের কানে এলো তার মাতৃভাষার একটা প্রশ্ন—‘আপনি কে? আপনি এখানে কেন?’

ইংরেজি বলছে লোকটা। বলাই স্বাভাবিক। কারণ ইংরেজ বিমানেরই চালক এ। কিন্তু আর একটা লোক, সে অবশ্য কথা যা বলেছিল, তা বলেছিল জার্মান ভাষায়—

এর কথা শুনে তাকে কেন মনে পড়ে টারজানের? সেই মিচেলস! হতভাগা জার্মান গুপ্তচরটা! টারজান কয়েকবারই প্রাণ রক্ষা করেছিল তার। একবার হারানিধির গ্রাস থেকে, আর একবার নিউ কার্ভিফের হোটেলের, পাখও মুয়েববার্নকের আক্রমণ থেকে। তারও পরে, টারজানের নিজের তরফ থেকে ওর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সে দণ্ড দেয়নি ওকে। কেশম্পর্শও করেনি। আশা করেছিল, ওর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। কিন্তু এই লোকটাই যদি সে হয়?

না, কী করে তা হতে পারে? সে ছিল জার্মান গুপ্তচর, এ হলো ইংরেজ বৈমানিক। ধুস্তোর! মৃত্যুকালে যতসব আজ্ঞে-বাজ্ঞে চিন্তা! তার চেয়ে, যেটুকু সময় হাতে আছে, তন্ময় হয়ে ভেবে দেখা উচিত, রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে কিনা।

আবার একটা সিংহগর্জন। আরও নিকটে। আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে যারা ভোজ শুরু করার জন্য, ভয় পেয়ে এ ওকে কনুইয়ের গুঁতো দিচ্ছে। সর্দার চারজন সশস্ত্র জোয়ানকে জঙ্গলের দিকটাতে প্রহরী মোতায়েন করল, যাতে সিংহটা আচমকা এসে লাফিয়ে পড়তে না পারে।

অস্ত্র হাতে নিম্নেও কিন্তু কাফ্রী জোয়ানেরা নুয়ার মোকাবিলা করতে ভরসা পায় না। অগত্যা জোরে জোরে পিটোও ঢাক। ছয়টা ঢাক আছে বস্তিতে। দু’টোর বেশি কদাচ একসঙ্গে বাজানো হয় না। আজ সর্দার হুকুম দিল একসঙ্গে সব কয়টা বাজাতে। দেখা যাক, অত শোর হাঙ্গামেও সিংহেরা ভয় পায় কিনা!

না, সিংহেরা ভয় পায় না ওতেও। ঢাক বাজতে থাকার দরুন বরং মুশকিল হলো প্রহরীদের। শত চ্যাচামেচি করেও তারা আর পরস্পরের খবরাখবর নিতে পারছে না। কিন্তু সর্দার মাংস মাতান, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রহরী পাঠিয়েই সে নিশ্চিন্তি হয়নি। তাদের হাল কী এই মুহূর্তে দেখবার জন্য নিজে

একসময় উঠে এল জঙ্গলের দিকে।

হায়, হায়! হে বোঙ্গা, এ তুমি করলে কী? চার চারজন প্রহরী, সাজেয়ান, কোথায় তারা? মশাল একটা এনেছে সর্দার। পাঁকাটির মতো সৰু। সহজদাতা একটা কাঠ মেলে আফ্রিকার জঙ্গলে, নাম তার বাঘুরা, তারই বাড়িল বেঁধে মশাল বানায় ওরা। তা এক ফুট একটা বাঘুরার তাড়া এক ঘণ্টা আন্দাজ স্থলে, যদি হাওয়ায় তেমন জোর না থাকে। সে জোর থাকলে মশালটা স্থলে শেষ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

সেই বাঘুরার আগুনে সর্দার যা দেখল, তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ। দেখল যে প্রহরীদের যেখানে থাকবার কথা, তারা নেই সেখানে। থাকবার মধ্যে আছে এক এক চাপ রক্ত।

এ কী? সিংহে তুলে নিয়ে গেল চার চারটে প্রহরীকে? কতগুলো সিংহ এসেছিল তাহলে? একটা সিংহের পক্ষে তো এ কাজ করা আদৌ সম্ভব নয়! একটাকে মারল, সেটাকে সেখানে বসে খেয়ে ফেলার সুবিধা যদি না থাকে, টেনে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। সেখানে বসে তাকে জঠরে পুরলো ধীরে সুস্থে আরামে। একটাকে দূরে সরিয়ে রেখে আবার ফিরে আসা আর একটাকে ঘায়েল করবার জন্য! কোনো মূলুকেই নুমা শীটা বা অন্য হিংস্রদের এমন ধারা রীতি নয়। এটা তাহলে হলো কী?

সর্দার বুদ্ধিমান লোক। গিয়েই যদি থাকে চারজন সৈনিক তার, সেই শোকে মুহূর্তমান হয়ে ভোজটা বন্ধ করে দেওয়ার সে মোটেই পক্ষপাতী নয়। বস্তিসুদ্ধ মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে আছে, আর মাংস সর্দার কিনা এখন ঘোষণা করে দেবে যে ভোজ আজকার মতো মূলতুবি রাখা হলো? গাঁয়ের লোক থুথু দেবে না তার মুখে?

না, ভোজটা মূলতুবি রাখা সম্ভব নয়। তবে যত তাড়াতাড়ি হয়। বোঙ্গা-ঠাকুরের সমুখে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকে এমন সব উৎসবে, সেগুলো শেষ হতে দেরি নেই আর। হয়ে গেলেই যাতে লোকজন খেতে বসতে পারে, তারই ব্যবস্থা হোক। ‘আগুন ছালো’, হুকুম দিল সর্দার। বৃত্তাকারে বাঘুরা সাজানোই রয়েছে

দু’টো বন্দীকে ঘিরে, তাতে আগুন লাগাবে এবার স্বেচ্ছাসেবকেরা। বাঘুরা ভাল করে স্থলে উঠলে তার উপরে চাপাবে ভারী কাঠ। শুকনো কাঠের কোনো অভাব নেই বস্তিতে।

আগুন লাগিয়েছে বাঘুরার পাঁজায়। ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। টারজান পিঠের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটা পরামর্শ দিল মৃত্যুপথের সহযাত্রীকে, ‘যদি পুড়ে মরার যন্ত্রণাটা সংক্ষিপ্ত করতে চাও, এই ধোঁয়া যথেষ্ট পরিমাণে গেলো। চটপট অজ্ঞান হয়ে যাবে।’

পিঠের দিকের লোকটা জিজ্ঞাসা করলে—‘তুমি গিলছ?’

সে কথার আর উত্তর সে পেলো না।

উত্তর পেলো না, কিন্তু অন্য একটা আওয়াজ শুনতে পেলো। চমকে উঠল তা শুনে। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে। একটা সিংহ গর্জে উঠল ঠিক তার ঘাড়ের পিছনে। কখন এল এত কাছে? এলো তো লাফালো না কেন? পিছনের বন্দীকে যদি ধরে থাকে, তাহলে সে লোকটাই বা টুঁ শব্দটি করল না কেন? এরই মধ্যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে নাকি? ধোঁয়া গেলার অত গুণ? তাহলে সেও আর দেরি করবে না। গায়ে আগুনের আঁচ এরই মধ্যে লাগছে যে!

সিংহনাদ সমানে চলেছে। ঠিক ওর ঘাড়ের পিছনে। যেখানে দু’ নম্বর বন্দী একটু আগেও ছিল। এখন তার টুঁ শব্দটি নেই।

এক টোঁক ধোঁয়া সে গিলে ফেলেছে। নারকীয়! এ যে কুইনিনের চেয়ে তেতো! কিন্তু ও কী? এইবার নিয়ে তিনবার সিংহের ডাক! এবার অত কাছে নয়। এ কী ভেলকি!

সত্যিই সিংহ। একটা নয় কয়েকটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে, আকাশ-ফাটানো বজ্রনাদে। একটা বিরাট কালো সিংহ এসে থাবা বসিয়েছে মাংস সর্দারের কাঁধে। এদিকে হাউমাউ আর্তনাদ সর্দারের, এদিকে টারজানের হুঙ্কার।

এক নম্বর বন্দী যে সিংহগর্জন নিজের ঘাড়ের পিছনে শুনেছিল, তা আসলে সিংহগর্জনই নয়, গর্জনটা টারজানের। সে তো ইচ্ছামতো মহাকপির গর্জন, নুমা শীটা ট্যান্টরের গর্জন সবই হব্ব অনুকরণ

থাবা বসিয়েছে মাংস সর্দারের কাঁধে।



করতে পারে, তাদেরই নিজস্ব ভাষায় নিজের মনোভাব জানাতেও পারে তাদের! এ ক্ষেত্রে তার বার্তাটা ছিল হারানিধির উদ্দেশ্যে, 'দ্বিধা কোনো না বন্ধু! এসেছে যদি, বাঁচাও আমাকে।' হারানিধি বুঝেছে সে ডাকের অর্থ, দলবল নিয়ে এসেছে ছুটে। মরু পাহাড় পেরুবার সময় সে বেশ কয়েকটা স্বজাতি জোটাতে সক্ষম হয়েছিল, প্রহরীসংহারে তাদের সহযোগিতাও সে পেয়েছে।

মাংরু সর্দার চেষ্টা করছে হারানিধির আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেতে, টারজান তাকে বলল জার্মান জবানে, এ অঞ্চলের মাতব্বর কাক্ত্রীরা অনেকেই বোঝে ঐ ভাষাটা—'যদি বাঁচতে চাও, আগে কাউকে বল আমাদের হাতপায়ের বাঁধন কেটে দিতে। তা যদি না কর, আমরা মরব আগুনে পুড়ে, তোমরা যাবে ন্যুমার উদরে। দেখেছ, কত সিংহ আছে আমার তাঁবে?'

দ্বিতীয়বার একথা বলার দরকার হলো না। মাংরুর হুকুমে তার জোয়ানারা দৌড়ে এসে বাঁধন কেটে দিল দুই বন্দী। হারানিধি যখন মাংরুকে ছেড়ে দিল তার আলিঙ্গন থেকে, তখন সে নিজে বাঁধা পড়ল টারজানের আলিঙ্গনে।

আগুন নিবিয়ে ফেলেছে কালোরা। আলো বলতে এখন সামান্য একটু ফিকে জোছনা। সেই আলোতে দুই মুক্ত বন্দী মুখোমুখি দাঁড়ালো। এক নম্বর বললো দুই নম্বরকে, 'ধন্যবাদ আপনাকে।' দুই নম্বরের মনে সেই একই খটকা। এক নম্বরকে সে চিনি চিনি করেও চিনতে পারছে না।

পরদিন বিকালে পশ্চিম আফ্রিকার কোনো এক পার্বত্য সেনানিবাসে পৌঁছেলো সেই অপয়া বিমান। যদিও এখন আর তাকে অপয়া বলার পক্ষে যুক্তি কিছু নেই।

বিমানে উঠেই টারজান চিনতে পেরেছিল তার সহবন্দী তথা বিমানচালককে। তার জীবনের সেরা চমক সে খেয়েছিল তখনই। আরে, এ যে সেই মিচেলস্! যাকে কর্নেল আন্দ্রেজের শিবিরে সে প্রথম দেখেছিল। যাকে ঘৃণ্য গুপ্তচর বলে সে জেনেছে এতদিন।

মিচেলস্ হেসে বলেছিল—'চিনতে পারলে আজ বোধহয় আমাকে রক্ষা করতেন না?'

টারজান জবাব দিল—'চিনতে পেরেও ন্যুমার গ্রাস থেকে কি সেদিন করিনি রক্ষা? ঘোড়া চাপা পড়েছিলে, মনে নেই? কিন্তু সেকথা থাকুক, তুমি হলে জার্মান, ইংরেজ এয়ার ফোর্সের বিমান তুমি পেলেই বা কী করে, এবং ইংরেজ শিবিরে তুমি যাচ্ছই বা কোন সাহসে এবং কেন?'

মিচেলস্ এবার হাসলো, বড় মিষ্টি হাসি একটু—'জেনারেল মার্কুইস অকল্যান্ডকে আপনি চেনেন তো?'

টারজান উদাসীন ভাবে বলল—'হাউস অব লর্ডস্-এ পাশাপাশি বসেছিলাম কয়েক মাস—'

'তা তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন সব। শুনে খুব অবাক হবেন, এ কথা আমি জোর করেই বলছি আগে থেকে।'

অবাক? নির্বাক, হতবাক একেবারে টারজান। প্রথমেই তো জেনারেল অকল্যান্ড আনন্দে অধীর, লর্ড গ্রেস্টোককে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পেয়ে। তারপর, সমুচিত সাদর সম্ভাষণের পালা সাদ্ধ হলো যখন, অকল্যান্ডের কাছ থেকে টারজান খবর পেলো তিনটি—

প্রথম খবর, মিচেলস্ বলে যাকে জানে টারজান, সে আসলে জার্মানই নয়, ইংরেজ। গুপ্তচরের কাজ সে করে ঠিকই, কিন্তু তা করে নিজের দেশ ও জাতির পক্ষেই। সেই বিপজ্জনক কাজের উপলক্ষেই তাকে ছদ্ম পরিচয়ে জার্মান শিবিরে ঘুরতে ফিরতে হয় হামেশাই।

দ্বিতীয় খবর, মিচেলস্ বলে যাকে জানে টারজান সে আসলে পুরুষই নয়, নারী। ইংরেজ অভিজাত বংশেরই শিক্ষিতা কুমারী। নাম তার মিচেলস্ নয়, ক্লারা মাইকেল। তার স্বর্গত পিতা কর্নেল মাইকেল এক সময় লর্ড অকল্যান্ডের সহকর্মী ছিলেন।

তৃতীয় খবর, জার্মান হানাদার কাপ্তেন মুয়েরবার্নক যেদিন নিই কার্ডিফের হোটেলে মারা পড়ল, সেদিন টারজানের প্রস্থানের পরে কাপ্তেনের পোশাকের ভিতর থেকে একখানা ডায়েরি উদ্ধার করে মিচেলস্ ওরফে ক্লারা মাইকেল। তার এক পাতায় মুয়েরবার্নকের নিজ হাতের লেখা কয়েকটা লাইন ছিল এই রকম—'লেডী গ্রেস্টোককে আমি হত্যা করিনি, তাঁকে বন্দী করে কর্নেল আন্দ্রেজের হাতে অর্পণ করেছিলাম।'

অকল্যান্ড আরও খবর দিলেন—লেডী জেন এতদিন জার্মানিতে ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে। সাম্প্রতিক বন্দী বিনিময়ের ফলে মুক্তি পেয়েছেন তিনিও। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে রওনা হয়েছেন ওয়াজিরিস্তানের খামারের উদ্দেশ্যে।

ডায়েরিতে এ কথাও লিখে গিয়েছিল মুয়েরবার্নক—সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঘোঁকা দেওয়ার মতলবে, দাস্তায় নিহত আগুনে পোড়া একটা ওয়াজিরি মেয়েকে লেডী জেনের পোশাক গয়না পরিয়ে সে ফেলে এসেছিল লেডী জেন-এর শোবার ঘরে। লকেট সমেত কয়েকটা দামী গয়না অবশ্য সে নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করেছিল।

এই শেষের খবরটুকু অবশ্য কোনো খবরই নয় টারজানের কাছে! জেন-এর সেই লকেট তো কবে থেকে টারজানের অধিকারেই রয়েছে! যথাসময়ে সেটা সে জেনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, এই প্রত্যাশাতেই তার আনন্দ।

অকল্যান্ডের শিবির থেকে টারজান অচিরেই ফিরল। লেডী জেন আসছেন, খামারটা যথাসম্ভব মেরামত করে তুলতে হবে তার আগে।

এলেন লেডী জেন। এই পুনর্মিলন উপলক্ষে যে-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন লর্ড গ্রেস্টোক, তাতে সমাদৃত অতিথি ছিল দুইজন। এক, মিস্ ক্লারা মাইকেল। দুই, ন্যুমা হারানিধি।

শেষ

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ



ভুতুড়েডাঙার ভয়ঙ্কর রাত

সমীর ধর

কলকাতায় থেকে এতদিন বুঝিনি এমন একটা উদ্ভট রেল স্টেশন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। শীতের সন্ধ্যা বসতে না বসতেই পেরিয়ে যায় শেষ ট্রেন। চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। স্টেশনমাস্টারের ঘরেই কেবল লম্পের আলো। মাফলারের মধ্যে থেকে চোখ-মুখ খুঁজে মানুষ বার করার জো নেই। তবুও আসতে হলো তাঁরই কাছে।

পিকলু সবক্ষেত্রেই ওপেনিং ব্যাটসম্যান। মাঠেও। বাইরেও। যথারীতি গাভাস্কার-সুলভ বেষ্টে চেহারায ভুতুড়েডাঙা স্টেশন মাস্টারের মুখোমুখি হলো।

স্যার, খুব ডিফেন্ডিত পিকলু।

কে? কি চাই? আচমকা মাফলারের মধ্যে থেকেই গমগমিয়ে উঠলেন মানুষটি।

আমরা ভুতুড়েডাঙা প্রাইমারি স্কুল যাবো। খুব শান্ত গলায়

আবার বলল পিকলু।

তা যাও না। কে তোমাদের না-যেতে বলছে।

আঃ! ভারি একটা বিরক্তির শব্দ গলা কাঁপিয়ে নামছিল আমার। পিকলু মুখ চেপে ধরে নিল। লম্পের আলোয় তিনি বোধহয় দেখেননি।

না, মানে বলছিলাম, আমাদের বন্ধুর বাবা ঐ স্কুলের হেডস্যার। ওখানে ওদের বড় বাড়ি। আমরা দুদিন থাকতে এসেছি।

থাকো না গিয়ে। আমি আটকাবো কেন? ভারি মুশকিল।

মুশকিলটা তো স্যার আমাদের। রতনের বাড়ি থেকে কেউ আসবে ঠিক ছিল। এখন তো দেখছি সারা তল্লাট জুড়ে আপনি ছাড়া আর কেউই নেই। আমাদের সঙ্গে ট্রেন থেকে নামলও না কেউ।

তোমরা না জ্বালিয়ে বিদেয় হও দেখি। ভুতুড়েডাঙা প্রাইমারি স্কুল এখান থেকে দু'ফ্রোশ। পা চালিয়ে চললে ঘন্টাটাক....

দু'ফ্রোশ! মানে চার মাইল। আমার গলা শুকিয়ে কোনো ক্রমে বেরুল। পিকলুর বড়সড় চিমটিটা হাতে জমিয়ে বসতেই কুঁই কুঁই করে চুপ করে গেলাম।

তা নয় স্যার। ডায়রেকশানটা যদি একটু...

একনিম্মাসে স্টেশনমাস্টার বলে গেলেন, এখন থেকে বাইরে বেরুলে তিন মাতার মোড়। তার মাঝেরটি ধরে নাক বরাবর গেলেই ভুতুড়েডাঙা..

বাস, তাহলে চিনে নিতে পারব। আমি মাঝখান থেকে বলে উঠলাম।

ভারি মুশকিল তো, আমায় বলতে দেবে, না ফাজলমি করবে? রেগে উঠলেন মানুষটি।

না স্যার, ওর ওই রকমই স্বভাব। পিকলু খুব শান্তভাবে বজায় রেখেই বলল, আপনি বলুন।

বলব আর কি। ভুতুড়েডাঙার জঙ্গল ধরে মাইলখানেক গেলে কালীবাড়ি। সেখানে রাস্তার বাঁক দুদিকে। ডানদিকেরটি সোজা চলে গেছে নিকো পার্ক...

নিকো পার্ক! এই ভুতুড়েডাঙায়...

আঃ পার্ক নয়, ওটা এক সময় পার্ক হবে হয়তো। এখন পাচা পুকুর। গন্ধেই টের পাবে। সেই পাড় ঘেঁষে ডান হাতি রাস্তা সোজা চলে গেছে ভুতুড়েডাঙা প্রাইমারি স্কুল। বাস, আর জ্বলিও না। আমার কাজ আছে।

লম্প হাতে নিয়ে তিনি উঠে গেলেন অন্যদিকে। আমি আর পিকলু যথারীতি সেই আগের মতোই। ডায়রেকশন মুখস্থ রাখার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ। হয়তো পিকলুর মনে থাকতে পারে এই আশায় ওর পিছু পিছু এগোলাম।

বাইরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে হিমহিম সন্ধ্যা। ফেব্রুয়ারির শেষ। কলকাতার হাফ বা ফুলশাট্টেই চলে যায়। এখানে বন-বাদাড় ফাঁকা অঞ্চলের জন্য আমাদের হাফ সোয়েটারের ওপরও কাঁপ ধরছে। অবশ্য সেটা শীতের জন্য নয় বোধহয়।

বাবলু কি করবি? পিকলু বলল।

দূর ছাই, ফিরে চ', আমার ভীষণ ভয় লাগছে। রতনটা একটা যা-তা। আসুক কলকাতায়...

রতনের ওপর চটখিস কেন? ও তো বলেইছিল লোক পাঠাবে। হয়তো কোনো অসুবিধা ছিল। তাছাড়া ফেরার ট্রেনও তো নেই।

অগত্যা, কোনোক্রমে আমার গলা থেকে বেরুল। মাথার মধ্যে শ' খানেক কেয়ো হাঁটছে। কী বীভৎস তাওব তাদের। একে ভর সন্ধ্যা। তার ওপর অচেনা জায়গা। কলকাতার আলোর শহর এখানে এক হাজার বছর পরেও হবে বলে মনে হয় না। খাঁটি পাড়ারগা। একেবারেই অজ। আমি তো বুঝতেই পারছি না এমন সব গ্রামে মানুষ থাকে কি করে।

রতন কলকাতায় আমাদের সঙ্গে পড়ে। হস্টেলে থাকে। টেস্টের আগে রতন তাদের দেশের বাড়িতে যাবার নেমন্ত্রণটা করেছিল। রতনকে বলেছিলাম টেস্টের পর যাবো ওদের গ্রাম দেখতে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই সুনসান রাস্তা। দু' একটা সাইকেল শেরিয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ঠিক ঠাहर হয় না। সন্ধ্যা মানে গ্রামে-গঞ্জের মাঝরাত। কেরোসিন খরচ না করে সবাই ঘুমিয়ে

পড়ে। লেখাপড়ার পাট যাদের আছে তারাও। হয়তো ভোরে ওঠে।

পিকলুর কাঁধে সাইড ব্যাগ। আমারও। দুজনের ব্যাগে দু'রাতের মতো জামাকাপড়। আমার সঙ্গে কখনো ডিটেকটিভ গল্পের বই।

রাস্তা খালি হয়ে গেছিল। স্টেশন ছাড়িয়ে আমরা ক্রমশ লোকালয় শেষ করে ফেলেছি। আকাশে ব্লটিং পেপারের মতো শুষ্ক নেওয়া কালো। কতগুলো তারা ব্যর্থভাবে উঁকিঝুঁকি মারছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমরা যদি এমন কোনো স্যাটেলাইট আকাশে পাঠাতে পারতাম যাতে অন্ধকারও শহীদ মিনারের মাথার মতো স্বলস্বল করে। কিংবা যদি রিমোট কন্ট্রোলে হঠাৎ করে আলো জ্বলিয়ে পথ হাঁটা যেত।

আমি এত সব ভাবছি, অথচ পিকলু হাঁটছে আপনমনে। ও নির্ধাৎ মনে মনে আওড়ে চলেছে স্টেশনমাস্টারের দেওয়া ঠিকানা। ভারি নাম জায়গাটার। ভুতুড়েডাঙা। নামটা মনে আসতেই সারা শরীরে শূঁয়োপোকা হেঁটে গেল। পায়ের গোড়াজে জুতোর ভারও বাড়ল বেশ। হাত-পা ক্রিকেট ব্যাটের মতো স্টাঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। ডাকলাম, এই পিকলু? ওভাবে পা চালাচ্ছিস কেন?

ঘুরে দাঁড়ালো পিকলু। জ্বোরে না হাঁটলে পৌঁছবি কখন?

বারে, আমি যে পিছিয়ে পড়ছি।

শস্‌স্‌।

হঠাৎ পিকলু দাঁড়িয়ে পড়ল। দূর থেকে কেমন একটা শব্দ ভেসে আসছে। ভারি বিদকুটে। ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ। সেই সঙ্গে চিঁচিঁ চিঁচিঁ।

শোন শোন। ঐ বোধহয় এক্সা...

পিকলু আমার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের চেটো সাপের ফণার মতো কানের পাশে মেলে ধরল।

ধ্যাৎ এক্সা নয়। এই অজর্গায়ে এত রাতে এক্সা! কই স্টেশনে তো দেখলাম না।

আরে বাবা রতনই পাঠিয়েছে এমনও তো হতে পারে। এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন।

আমি পরিষ্কার শুনলাম পিকলুর গলার স্বর মিইয়ে গেছে। ওর আত্মবিশ্বাসে টান পড়ছে। সামনে রাস্তা ক্রমশ সৰু। পিচ রোড নয়। বনের ভেতর ঢুকেছে সাপের মতোই ঐক্যবৈক্যে। দু' পাশে লম্বা লম্বা গাছ। কোনোটা ঘাড় উঁচিয়েও পুরো দেখা যায় না। ঘন চাপ চাপ অন্ধকারে ধুলোর রাস্তাই জেগে আছে অম্পষ্ট। সেই রাস্তায় এখন আমরা দুজন। আমাদের পা আর চলছে না। পিকলু আমার গা ঘেঁষে চলছে। কোনো শব্দ নেই। চারিদিকে কেবল ঝিঝির ডাক। কোথাও ভেঁকে উঠছে একদল শেয়াল। এ বনে বাঘ-ভালুক আছে কিনা জানি না। খাঁ-খাঁ করা অন্ধকারে আমার সমস্ত চেতনাই ক্রমশ লোপ পেয়ে আসছে।

হঠাৎ থেমে গেল পিকলু। একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। বনের

রাস্তা এখনও অনেকখানি। পিকলুকে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে শুকনো গলায় প্রশ্ন করলাম, কি হলো? থামলি যে...

ওই দ্যাখ। বাবলু...

ভয়ে ওর গলা থেকে স্বর বেরুল না। আমি আগেই মিইয়ে পড়েছিলাম। পিকলুকে ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হাত-পা পেটের মধ্যে সঁদিয়ে গিয়েছিল। শুধু অস্পষ্ট চোখে দেখতে পেলাম অদ্ভুত একটা সাদা ঘোড়ার একা। দুধসাদা রঙ। কুয়াশায় ঢাকা বরফের মতো। চিঁই চিঁই করে ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে। একায়ে কোনো মানুষজন চেনা যাচ্ছে না।

আঁ-আঁ-আঁ-আঁ- ভু-উ-উ-ত...

আর কিছু মনে পড়ছে না। জ্ঞান হারাচ্ছি ক্রমশ। পিকলু আমার সাইড ব্যাগটা নিয়ে আমার মাথাটা টেনে রাখল ওর কাঁধে। ও তখনও দাঁড়িয়ে।

এক্স এসে থামল।

এবার স্পষ্ট দেখল পিকলু লঠন হাতে একটা মানুষের অবয়ব। মুখ চোখ নাক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালো কিভুতকিমাকার। লঠনের আলোয় পরিষ্কার বোঝাও যাচ্ছে না, সে মানুষ না ছায়ামূর্তি।

হি হি হি হি, তোর কোথায় যাঁবি। নাকি সুরে প্রথমটায় হেসে উঠে প্রশ্ন করল সে।

পিকলু ভালো করে ভাবার অবকাশও পেল না। ঘোড়ার সামনের পা দুটো ঝাঁপিয়ে উঠল, সশব্দে বাজতে লাগল গলার ঘুড়ুর। চিঁই...চিঁই ডাকে নিস্তব্ধ পরিবেশ কঁপে উঠল। পিকলুর মনে হলো, ভূমিকম্পে তলিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মার মুখখানা মনে করার চেষ্টা করল। কলকাতার সুখে থাকা জীবন। বন্ধু-বান্ধব। ইডেনের ক্রিকেট মাঠ। সব হারিয়ে গেল ভুতুড়ে ডাঙায়। কি কুকণেই যে রতনের নিমন্ত্রণ নিয়েছিল। সেই দুর্ভাগ্যই টেনে আনল ভূতের কবলে।

আর কিছু ভাবার আগেই ওদের দুজনকে একে একে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল সেই ভুতুড়ে দানব। দারুণ তার শরীরের জোর। একার পিছনের সিটে শুয়ে পিকলু বুঝল এক্সা ছুটছে। খুব জোরে। মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড় ডিঙিয়ে। নির্ঘাত ভূতের দেশে। কি সাজাটাই না হবে। পিকলুর মনে পড়ল ভূতের কাণ্ড-কারখানা। কত বইয়ে পড়েছে। সিনেমায় দেখেছে। কোনোদিন যা বিশ্বাস করেনি, আজ তাই চেপে বসেছে ঘাড়ে। নির্ঘাত মৃত্যু। কি শাস্তি পাবে ওরা দুজন? ভয়ে শিউরে উঠল সারা শরীর। এরা আবার কোন ভূত কে জানে। গেছো ভূত, মেছো ভূত, মামদো ভূত, শাঁকচুয়ী, ব্রহ্মদাতা অনেক কিছুর নাম সে শুনেছে। এই ভূত নিশ্চয়ই দানো-ভূত। অসম্ভব গায়ের জোর। বাবলুর মুখে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। পিকলু নিজে জ্ঞান হারাবার আগে দেখল চারিদিকে ভূত আর ভূত। সবাই কালো। মিশকালো। ভীষণ অন্ধকারে ঝলছে তাদের চোখ হ্যালোজেনের মতো। সেদিকে তাকানো যায় না।

ভয়ঙ্কর এক গুহার সামনে তাদের আটকে রাখা হয়েছে। ওদের হাত-পা বাঁধা। সামনে ঝলছে মশাল। কেউ কেউ নাচছে। কেউ নাকি সুরে গাইছে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কক্কাল। মড়ার খুলি। হাড়। শৈশাচিক দুর্গন্ধ। চোখ চেয়ে দেখা যায় না। বাবলুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একদল ভূত। তাদের হাত পা সৰ লিকপিকে, কাঠির মতো। ওকে নিয়ে গেল ঝলন্ত মশালের নিচে। উঃ মাগো! সে দৃশ্য দেখা যায় না। বাবলুর সারা শরীর খুবলে নিচ্ছে। হাত পা চোখ মুখ। একি! ও তো আর বাবলু নেই। জীবন্ত কক্কাল। হিঁ হিঁ করে হাসছে। তবে কি বাবলুও ভূত হয়ে গেল? পিকলু ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করল। বহুদূর থেকে ভেসে এল হাঁউ মাঁউ বাঁউ শব্দ। বাবলুই ভূত হয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। এবার নির্ঘাত ওর হাত পা মুখ শরীর খুবলে খুবলে....

গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ...

আমি পিকলু বাবলু অমন করছি কেন? ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারতে মারতে রতন ওদের দুজনকে নাড়াতে লাগল।

ভয়ে পাংশুটে চোখ দুটো অতিকষ্টে টেনে খোলার চেষ্টা করল পিকলু। পারল না। হাতে চিমটি কেটে দেখে নিল, নাঃ, এখনও মাংস আছে শরীরে। ভূত হয়নি। গোঁ গোঁ করতে করতে ওঠার চেষ্টা করে ফের শুয়ে পড়ল।

আমি পিকলু আমি রতন। তোরা দুজনেই আমাদের বাড়িতে। চোখ খোল।

আমরা এখানে কি করে এলাম...কেটে কেটে বাবলু বলে উঠল। ওর জ্ঞানও মিরছে। তবে ভীষণ হুঁপাচ্ছে।

খ্যাং, তোরা যে কি? আমার প্রেস্টিজটাই দিলি পাংচার করে। কত করে কাকাকে বলেছিলাম তোরা কলকাতার ছেলে, সহজে ভয়ে কাবু হোস না।

হো হো করে হেসে উঠলেন একজন। পিকলু আর বাবলু তাঁর দিকে তাকাতেই চমকে উঠল।

স্টে-শ-ন মা-স্টা-র? বাবলু বলে উঠল।

আরে না, এই তো সেই এক্সাওয়াল। সাদা ঘোড়ার এক্সা। চৌচায়ে বলল পিকলু।

রতন ওদের দুজনকে টেনে উঠিয়ে বসাতে বসাতে বলল, দুটোই ঠিক। কাকাই বলেছিল আমি ওদের নিয়ে আসব। আমাদের এক্সা আছে। আমার কাকাই এখানকার স্টেশনমাস্টার।

হো হো করে হাসিতে রতনের কাকা ফেটে পড়লেন। সেই মাফলার ঢাকা কালো কোটের স্টেশনমাস্টার। তখনই ধমক, থামো তো ঠাকুরপো। ছেলে দুটো তো ভয়ে মরেই যেতে বসেছিল। ওভাবে কেউ ভয় দেখায়। ওঠো বাবা, গরম গরম লুচি আর আলুর ছেঁচকি এনেছি। হাত মুখ ধুয়ে তোমরা খেয়ে নাও তো।

রতনের মায়ের প্রশান্ত মুখখানা দেখে পিকলু আর বাবলুর প্রাণটা ছড়িয়ে গেল। তখনও কাকার সামনে প্রেস্টিজ হারিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রতন।

ছবি : বিজন কর্মকার

হাঁদা- ভোদার

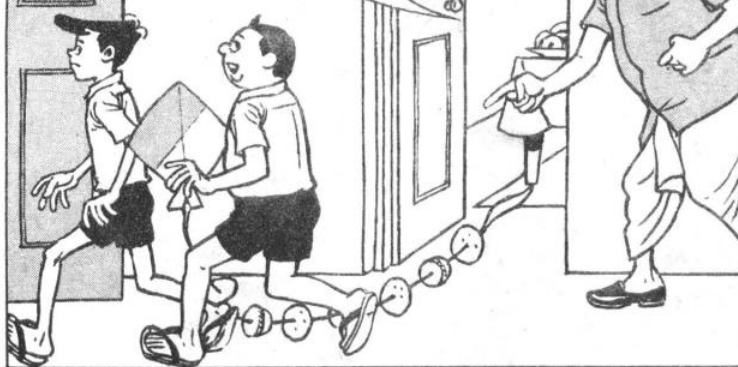


খাবার
দখল



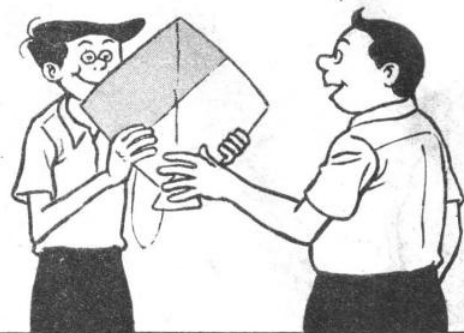
ঠিক তখনই

আচ্ছা, তোরা তাহলে লুচি আর কেক দিয়ে ঘুড়ির লেজ বানিয়েছিস, তাই না? শিগগির ফিরে আস আর ওগুলি রেখে যা!



কুছপরোয়া নেই, ঠোঁদা-আমরা এখনো আমার এই ঘুড়ি দিয়ে মজা করতে পারি!

ওটা আমাকে দে, হাঁদা-আমার একটা মতলব এসেছে!



সেই মতো

কি ঘটলো? টি.ডি.র ছবি কিরকম অক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে!

ঘুড়িটার জন্যে পিসেমশাই-ওটা অ্যাংকেনায় জড়িয়ে গেছে!

আমি ওটা খুলে নিচ্ছি!



এটা একেবারে জটিল বিশৃঙ্খলা! আমার দ্বারা হবে না!

আমি ওপরে এসে তোমার সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি!



(পিসেমশাই আর তার দোস্ত ছাদে উঠেছে) ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই, মই-ই উরসা, তাই উরসাতাকে ফর্সা করে দিচ্ছি, হিঃ হিঃ!

আমার সঙ্গে থেকে তোর বুদ্ধি অনেক ঝালতাই হয়েছে, ঠোঁদা!



শিগগির মই ফিরিয়ে নিয়ে আস, হতচ্ছাড়া!

হেল্প!

কি রকম হলো বলতো, হাঁদা?

তুই একেবারে ছাদে তুলে মই কেড়ে নিয়েছিস! তোর বিরেট মাথায়! এবার একটু বুদ্ধির খিলিক দিচ্ছে, ঠোঁদা!





ট্রেনটা এরকম ভোগাবে ভাবেনি মনোজ। জংশন স্টেশনে প্রায় এক ঘণ্টা লেট। ফলে গন্তব্যস্থলে যখন ও নামলো তখন হাতঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুইছুই করছে। মাঘ মাসের ঠাণ্ডা কনকনে হিমের রাত। স্টেশন চত্বর শেরিয়ে আসতেই হাওয়া যেন আঁচড় কাটলো সর্বাস্থে। ব্যাগ থেকে চাদর বার করে জড়িয়ে নিলো গায়ে। তবু শীতকে বাগে আনা যাচ্ছে না। একটাও রিকশা নেই ধারে কাছে। এত রাতে না থাকাটাই স্বাভাবিক। অগত্যা হট্টন ছাড়া গতি কি!

স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে পাক্সা দশ মিনিট। লীলামাসীরা সবাই বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাবতে তাবতে হনহন করে হাঁটছিল মনোজ। একটা জরুরী খবর নিয়ে এসেছে সে। চাকরি সংক্রান্ত। মায়ের দূরসম্পর্কিত বোন লীলামাসীর ছোট ছেলেটা গ্রাজুয়েট হয়ে অনেকদিন বেকার বসে আছে। তারই একটা কর্মসংস্থানের খবর। দুদিন দেরি হলে চাকরিটা আর হবে না। তাই অফিসফেরতা এতটা পথ তার আসা। ট্রেনটা সুবোধ ছেলের মতো এলে ন'টার মধ্যে লীলামাসীর বাড়ি সে পৌঁছে যেত। তারপর কথাবার্তা সেরে খেয়েদেয়ে ঢুকে পড়ত উষ্ণ লেপের নিশ্চিন্ত আরামে। তার বদলে কিনা তাকে ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো হাঁটতে হচ্ছে একা ক্লান্ত শরীরে। একটা হাই উঠলো মনোজের। চোখ জড়িয়ে যেন রাজ্যের ঘুম নেমে আসতে চাইছে।

বাসদের কাঁঠালবাগান পেরিয়ে এল। আর একটু এগোলেই লাহাদের পোড়ো জমি। তারপর সিধুমামার দোতলা বাড়ি। ব্যস তারপরই লীলামাসীর বাড়ি। একটু জোরেই পা চালায় এবার মনোজ। ঠাণ্ডাকে আর কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না।

আশ্চর্য ব্যাপার! সিধুমামার বাড়ির গেটের সামনে কে যেন

দাঁড়িয়ে। এত রাত্তিরে, ঠাণ্ডার মধ্যে। একটু এগোতেই চেনা গলা খাঁকারিটা শোনা গেল। আর সন্দেহ নেই। সিধুমামাই দাঁড়িয়ে আছেন। দশ হাত দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোটা আবছা ভাবে এসে পড়েছে মুখে। গায় জড়ানো একটা তুসতুসে আলোয়ান। মনোজ অবাক না হয়ে পারে না।

কি ব্যাপার সিধুমামা এত রাত্তিরে একা দাঁড়িয়ে। কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?

অভ্যাসজনিত গলা খাঁকারি আবার শোনা গেল। সিধুমামা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমারও তো দেখছি আজ অনেক রাত হলো আসতে মনু। একটু দাঁড়িয়ে যাও। তোমার লীলামাসীরা যে এক হস্তার জন্য পুরী গেছে সে খবর কি রাখো?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো মনোজের। এত রাত্তিরে এখন তবে সে কি করে! একটু ঘুমের জন্যে সমস্ত শরীর উপবাসীর মতো উন্মুখ হয়ে আছে।

সিধুমামাই সমস্যার সমাধান করে দিলেনঃ কোনো চিন্তা নেই মনু। আমার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দাও। আর কোথায় যাবে? ও বাড়িতে তো লম্বা তালা ঝুলছে। তবে বাপু আমার বাড়িতে কিন্তু কেউ নেই। বিয়ের নৈমন্ত্যে সবাই গেছে আসানসোল, আমি একা আছি পাহারায়।

সিধুমামার বাড়ি

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

মনোজ মনে মনে ভাগ্যকে সাধুবাদ দেয়। সত্যিই তো কি বিপদেই না পড়তো সে। গ্রামগঞ্জের ব্যাপার। শীতের রাতে একবার দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়লে লোক জাগাতে-জাগাতে ভোর হয়ে আসে। আর এখানে না চাইতেই আশ্রয়। সিধুমামার পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢোকে মনোজ। ঠাণ্ডায় মুখের খোলা অংশে কোনো সাড় নেই। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। হাতের টচটা ঝলিয়ে দরজা খোলেন সিধুমামা। পিছু-পিছু ঘরের মধ্যে ঢোকে মনোজ। ওঃ বাঁচা গেল! আপন মনেই বলে ওঠে সে।

সিধুমামা তার আত্মীয়পরিজন কেউ নন। মাসীর বাড়িতে যখনই এসেছে মনোজ তখনই দুচারজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সিধুমামা তাঁদেরই একজন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। তবে একটা অদ্ভুত শখ আছে তাঁর। ভুতুড়ে গল্পের বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। যাকে বলে বইয়ের পোকা ঠিক তাই। তাঁর পড়ার ঘরের তিন তিনটে আলমারি বোঝাই কেবলমাত্র ভুতুড়ে গল্পের বই। সেগুলো কাউকে ছুঁতে দেন না সিধুমামা। তাছাড়া ঘরের দেয়াল জুড়ে আছে ভয়ানক সব ভুতুড়ে মুখের ছবি। কি কি ভাবে যেন এগুলো সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করেছেন সিধুমামা। ঘরটার জানালাগুলো দিনের বেলাও বন্ধ থাকে। একটা হালকা সবুজ রঙের আলো ঝলে চকিঘন্টা। ফলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেই

গাটা কেমন হুমহুম করে ওঠে। সিধুমামার এই পড়ার ঘরের নাম নাকি কুহক। এ নিয়ে লীলামাসীদের বাড়িতে কত হাসাহাসি শুনেছে সে। এ তল্লাটে সবাই জানে সিধুমামার মাথায় সামান্য ছিট আছে। তবে ভদ্রলোক এমনিতে খুবই সজ্জন। কারো সাতপাঁচে থাকেন না কখনো। আলাপ-পরিচয়ে মনোজেরও খারাপ লাগেনি কোনোদিন।

নিশ্চুতি রাতে সিধুমামার নির্জন বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে মনোজের মাথায় এইসব ভাবনা চিন্তাই খেলা করছিল। কিন্তু উপায় কি! রাতের মতো একটা মাথা গাঁজার ঠাঁই তো চাই। রাগ হচ্ছিল ওর লীলামাসীর ওপর। এজন্যই বোধহয় শাস্ত্রে বলে—পরের ব্যাপারে নাক গলিও না।

সে না হয় হলো, এদিকে সে যে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে একেবারে। দরজা জানালা সব বন্ধ। তবু হিম আসছে কোথা থেকে? সিধুমামাই বা কোথায় গেলেন তাকে বসিয়ে রেখে? কেমন নিঃশব্দ হাঁটাচলা ভদ্রলোকের। পায়ের শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। মনোজের মনে পড়লো আগের বার চায়ের নৈমন্ত্রে সে যখন সিধুমামার বাড়ি এসেছিল, সেদিনও সিধুমামা আর মামী ছাড়া কাউকে দেখেনি। কুহকের ঘরটাতেই বসেছিল সে। সিলিং থেকে ঝুলছিল প্রকাণ্ড একটা মাকড়শার জাল। তার মাঝখানটায় বসেছিল ছমো চেহারা একটা মাকড়শা। মনোজের কেন যেন মনে হয়েছিল মাকড়শাটা ঠাণ্ডা চোখে তাকে নিরীক্ষণ করছে। ঘরটার মধ্যে কিছু একটা পুড়ছিল। ধূপ কি অন্যকিছু সে বুঝতে পারেনি। তবে মিউজিয়ামে গিয়ে এরকম একটা গন্ধ সে শেয়েছিল। একটা প্রাচীনতার গন্ধ, একটা নেশাদারানো অদ্ভুত বুনো গন্ধ। চায়ের স্বাদ সেদিন বিস্মাদ লেগেছিল তার। খানিকক্ষণ বসেই সে চলে এসেছিল।

পেছনে আবার সেই পরিচিত গলা খাঁকারির শব্দ। সিধুমামা এসে গেছেন।

চলো মনোজ পড়ার ঘরেই বসবে চলো। একটু চায়ের যোগাড় করে এলাম।

এখন চা! আপনি করলেন বুঝি? মনোজ অবাক হয়।

না রে বাবা, ওরাই থার্মোগ্যাস্কে ভরে যেখে গেছে। রাতে তো ভালো ঘুম হয় না। তাই মাঝে মাঝে উঠে একটু চা খাই। তার থেকেই তোমারও জুটবে।

কেমন দুলে দুলে হাসেন সিধুমামা। কথা না বাড়িয়ে মনোজ চলে আসে সেই পড়ার ঘরটিতে। কুহক! সত্যিই অদ্ভুত একটা নাম। লাল কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। মনে হচ্ছে এখনই বুঝি তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়বে। তেমনি ঝলছে অল্প পাওয়ারের সবুজ আলোটা। তেমনি অপার্থিব, প্রাচীনতার গন্ধ মেশানো ঘরের পরিবেশ। কাঠের আলমারির দিকে চোখ ফেরায় মনোজ। ভুতুড়ে বইগুলি নিঃশব্দ চোখে ওকে জরীপ করছে। দেয়ালে স্নান আলোয় জীবন্ত হয়ে উঠছে ভয়ঙ্কর ছবিগুলো। একটা দীর্ঘ নখওয়ালা লম্বা কালো হাত যেন ছবির গণ্ডি পেরিয়ে

বাইরে আসতে চাইছে। অস্বস্তিতে মনোজ চোখ সরিয়ে নেয়। মাকড়শার বিশাল জালটার মাঝখানটায় আজ একটা কুচকুচে কালো মাকড়শা। হঠাৎ সড়সড় করে সেটা উপরে উঠে গেল।

চা খাও মনোজ, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

মনোজ হাত বাড়ায়। রাত কি আর শেষ হবে না!

এমন সময় তার নজরে পড়ে, আর ভয়ানক ভাবে টাল খেয়ে চমকে ওঠে সে। এই ঘরে একটা মাত্র আয়না। আয়নার মুখোমুখিই বসেছে সে। একটু তফাতে ইজিচেয়ারে বসেছেন সিধুমামা। অথচ আয়নায় ফুটে উঠেছে শুধু মনোজের প্রতিচ্ছায়া। তার পেছনে ফাঁকা ইজিচেয়ার। সিধুমামার ছায়া পড়েনি আয়নার কাছে। তীব্র একটা আত্ননাদ উঠে আসে মনোজের গলা দিয়ে। চায়ের কাপটা কাঁপা হাত থেকে পড়ে যায় মেঝেতে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকায় মনোজ। দেখে সিধুমামা নেই।

ঘরের মধ্যে হঠাৎই একটা হাওয়া ওঠে। ঠাণ্ডা কনকনে হিমেল হাওয়া। কাঁচ করে খুলে যায় বন্ধ আলমারির কাচের পান্না। দেয়ালের ভুতুড়ে ছবিগুলি দুলে ওঠে। নাচের নেশায় পেয়েছে তাদের। একবার তীব্রভাবে ঝলে উঠেই দপ্ করে নিতে যায় সবজ্ঞে আলোটা। অন্ধকারের মধ্যে ভুবে যেতে যেতে মনোজ মুহূর্তের জন্যে শুনতে পায় সেই গলা খাঁকারির শব্দ। সিধুমামা তার কাছেপিঠেই কোথাও রয়েছেন।

এই প্রথম ভীষণ ভয় পেল মনোজ। প্রাণের ভয়, মরে যাবার ভয়। অবশ হয়ে এল তার দেহ। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার উষ্টে ফেলে দরজার দিকে সে প্রাণান্ত দৌড় লাগায়। হাতড়ে হাতড়ে খুলে ফেলল বাইরে যাবার দরজা। জরপর হাঁপাতে হাঁপাতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। আবহা নরম আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হয়ে আসছে। হনহন করে পা চালিয়ে লীলামাসীদের বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়াল। তার মাথার মধ্যটা ঘুরছে, আর সে দাঁড়াতে পারছে না। লীলামাসীর অনেক দিনের পুরনো কাজের লোক মধু তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে কিছু বলবার আগেই মনোজ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, বলতে পারো মধু, পাশের বাড়ির সিধুমামা কেমন আছেন?

তিনি তো নেই। গতকাল হঠাৎ মারা গেলেন হার্টফেল করে। আর এমন ভাগ্য দাদাবাবু, সেসময় বাড়িতে আবার কেউ ছিল না। কিন্তু আপনি এই ভোরবেলায় কোথা থেকে এলেন?

মনোজ কোনো উত্তর দেয় না। ধপ করে বসে পড়ে ধুলোর ওপর। ফিসফিস করে ওঠে আপনমনে, কিন্তু কাল রাতে আমি যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর দেওয়া চা খেয়েছি। তবে কি....?

ছবি: প্রশ্ন হাজরা

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন স্কুলে পড়ি। এখন যাকে তোমরা বলো ক্লাশ নাইন...আমরা বলতাম সেকেন্ড ক্লাশ। সেকেন্ড ক্লাশে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষাতে অর্কে ফেল করলাম। খবরটা পেয়ে আমার এক কাকা দেশের বাড়ির কাছে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তিনি ওই স্কুলের অঙ্ক-কাম-ড্রিল মাস্টারমশাই ছিলেন। জায়গাটা কলকাতা থেকে অনেক দূরে। শুনেছি সেখানে না আছে পাকা রাস্তা, না আছে ইলেকট্রিক। বলতে গেলে তেপান্তরের মাঠের ধারে একতলা পুলিশ ব্যারাকের মতো বোর্ডিং বাড়িটা। স্কুল থেকে খুব কাছে না-হলেও খুব দূরেও নয়। গোটা পঞ্চাশ ঘর—সব ঘরে দুজন করে ছাত্র থাকে।

স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে কাকার সঙ্গে চললাম বোর্ডিংয়ে। হাতে গোলাপ ফুলের ছবি-ছাপা টিনের বাস্র ও শতরঞ্চি দিয়ে বাঁধা বিছানা, বই-খাতাপত্র। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাছে-পিঠে কোনো বাড়ি বা দোকান নেই। বোর্ডিংয়ের চার ধারে পেঁয়াজ পেঁয়াজ নারকেল, তাল, আম, কাঁঠাল, শেওড়া, তেঁতুল, বেল—আরও অনেক গাছ। চারিদিক অন্ধকার নিঝুম দেখে আমার গা হুমহুম করতে লাগল। মনে হলো তাহলে কলকাতার লেক রোড ছেড়ে এখন থেকে এই জঙ্গলে থাকতে হবে! কাকা আমার

মুখ দেখে বললেন, এখন রাত্রি তো, তাই অন্ধকারে গাছশালাগুলো কালো কালো দেখাচ্ছে, সকালে উঠলে তোর মন আনন্দে ভরে যাবে। ছাদে একটাই ঘর, সেখানে তুই থাকবি। ছাদে দাঁড়ালে দেখতে পাবি ধানক্ষেত, রেললাইন, পুকুর, তালগাছঘেরা দীঘি। সকালবেলা কত রকম পাখির ডাক। এক মাসের মধ্যে শরীর সেরে যাবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, শরীর সারা চুলোয় যাক, বাঁচলে হয়। ভয়ে ভয়ে বললাম, একা একটা ঘরে...ছাদে?

কাকা বললেন, আপাতত রশিদ আছে। টেস্ট পরীক্ষার পর

কানে কানে কথা কয়

অসীম চৌধুরী



সে শক্তিগাড় চলে যাবে। তুই একাই থাকবি। কেউ ডিস্টার্ব করবে না। মন দিয়ে অঙ্ক করবি। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার বোস্বেটকে বলে দিয়েছি খাবার সময় তোকে বেশি তরকারি, বড় বড় পোনা মাছের টুকরো দেবে। বাড়িতে দেখিয়ে দিবি তুইও অঙ্কে একশর মধ্যে একশ পাওয়ার ছেলে!

আমি ভাবলাম, তবু ভাল—আপাতত রশিদ থাকবে।

কাকা আরও বললেন, রশিদ ছেলেটা ভাল। স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন, ক্লাশে ফাস্ট হয়। তবে দোষ, নিজের পড়া সাক্ষ করে অন্য ছাত্রদের ডিস্টার্ব করে। তোকে করলে বোস্বেটে মাস্টারকে কমপ্লেন করবি।

বোস্বেটে, সে আবার কী নাম? এখন অবশ্য ছেলেমেয়েদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম, অভিধানেও পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের আমলে বোস্বেটে-টোস্বেটে নাম কেউ রাখতো না।

বললাম, বোস্বেটে?

ওই, সারাদিন শুধু দীনের রায়ের রবার্ট ব্লেকের চিনে বোস্বেটের গল্প পড়ে—তাই। আসল নাম গণেশ। দুইমি করবি নে, বোস্বেটে খুব ভাল লোক। রশিদের সঙ্গে একটু খটমট আছে।

কাকা আমাকে ক্রমমেট রশিদ আলি আর ম্যানেজার বোস্বেটের হেফাজতে দিয়ে টিচারদের ইস্টেলে চলে গেলেন।

বোস্বেটে যেমনি মোটা তেমনি কালো, মহা ধূর্ত আর কলহবাজ। তার লাগতো বেশি রশিদের সঙ্গে।

কাকা চলে যাবার পর প্রথম কথাতেই বোস্বেটে মাস্টার আমাকে ভয় পাইয়ে দিলো। আমার তত্ত্বাপোশের মাথার উপর একটা আলকাতরা মাখানো জানালা ছিলো। পরে জেনেছিলাম উই থেকে বাঁচানোর জন্য জানালায় আলকাতরা মাখানো হতো। বোস্বেটে মাস্টার গম্ভীর মুখে খোলা জানালাটা বন্ধ করতে করতে বলল, এইটে ভুলেও খুলে শুবি নে। এর গায়েই যে আসশেওড়া গাছ দেখছিস, ওখানে অপদেবতা থাকে। ভুলেও ছাদে বাথরুম করবি নে। যে সব নারকেল, তাল, বেল, আম গাছ দেখছিস সেখানেও থাকে। অনেক ওঝাটোঝা দিয়ে ঝাড়মুক করা হয়েছে—যায়নি তেনারা। অমাবস্যার রাতে, শীতের রাতে বড়ই উৎপাত করে। এমন হল্লোড় করে সকলে মিলে যেন গাছগুলো নয়, ছাদটাই ভেঙে ফেলার মতো হয়।

রশিদ বলল, কেন বেচারীকে ডরাচ্ছেন? না রে, আমি থাকতে তোরা ভয় নেই।

তা তো নেই, তুই যে ভূতের রাজা। তোকে না করুক, একে করতে পারে।

রশিদ হেসে বলল, ম্যানেজার মাস্টারমশাই, সেই গভীর কালীপূজার সময় ঘুম ভেঙে আপনার বুকের উপর ছাগলের কাটা মুণ্ডু দেখে ভয় পাননি?

সে তো তোরা কাজ। ভূত আমার অশ্বাভিষ করবে। জানিস আমার কাছে ভূতের কবচ আছে? হরিহর তান্ত্রিকের দেওয়া।

কবচটা দেখলে ভূত কেন, ভূতের ফোর্টিন ফাদারস পালাবে। ভূজঙ্গবাবুর ভাইয়ের ব্যাটা বলেই জানান দিয়ে রাখলাম। তারপর যেতে যেতে বললেন, ভূতের রাজার সঙ্গে থাকবি—তোরা আবার ভয় কিসের? তবু মাথার তলায় একটা লোহাটোহা রেখে শুবি। ভয়টয় পেলো আমাকে বলবি। আমি তোকে হরিহর তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাবো।

বোর্ডিংয়ে আসার আগেও আমি দু-একবার ভূত দেখেছি। অনেকেই বলতো লোক রোডে আমাদের বাড়ির ছাদে গঙ্গাজলের ট্যাকের উপর কালো কালো ছায়া দেখেছে। গাছপালা, মানুষ, কাপড়-জামার নয়, অদ্ভুত এক ধোঁয়াটে ছায়া। তাই পারতপক্ষে আমি একা ছাদে যেতাম না। কারও সঙ্গে ছাদে দিনে দুপুরে গেলেও বড় বড় মরচেখরা ট্যাক দুটো দেখে গা ছমছম করতো। ঠাকমা প্রায়ই ছাদে এসে ট্যাক থেকে জল তুলে তুলসী গাছে দিতেন ও ডালা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন। আমায় বলতেন, যা তো দাদা, ট্যাকের ডালা বন্ধ করে দিয়ে আয়, নয়তো কাকে ময়লা ফেলবে। ট্যাকের কালো জল দেখলেই বুক টিপটিপ করতো। মনে হতো সেই ধোঁয়াটে ছায়া দুটো জলের মধ্যে বসে আছে। গেলেই ঘাঁক করে চেপে ধরবে। সেই ট্যাকের উপর সত্যি আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা ভূত দেখলাম। আজও স্পষ্ট মনে আছে।

একদিন স্কুল থেকে এসে শুনলাম পাশের বাড়ির মুখুজোমশাই লোক মার্কেটের দোকান বন্ধ করে এসে বাড়ি ঢুকেই বৃকে হাত দিয়ে মারা গেছেন। মানুষ মরে গেলে আর মৃতদেহ দেখলে আমার ভীষণ ভয় করতো। আমার এক পিসতুতো দাদা বলল, চল দেখে আসি।

যাবো না, তবু দাদা জোর করে নিয়ে গেলো। গিয়ে দেখি বৈঠকখানায় মুখুজোমশাই চিৎপটাং হয়ে শুয়ে। গায়ে ফতুয়া, খুতি হাঁটুর উপর, পায়ে চকচকে বুট জুতো। চোখ দুটো আবার খোলা। মনে হলো যেন আমারই দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছেন। তারই সঙ্গে শুনি বৃদ্ধা মুখুজো ঠাকুমার বিলাপ—তুমি যে কঁকড়া খেতে চেয়েছিলে, তোমার জন্যে রান্দলুম বাড়লুম, আর তুমি না খেয়ে চলে গেলে গো! আমার যে মাচ খাওয়া ঘুচলো গো! দারুণ বিকট গলায় কান্না।

সেই কাঁকড়া না খেয়ে হঠাৎ অক্সা পাওয়া মুখুজোমশাইকে একদিন সন্ধ্যাবেলা ট্যাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সত্যি একটুও মিথো নয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকমা বললেন, যা তো দাদা, ছাদে বাড়ির টিন ফেলে এসেছি। রোদে শুকুতে দিয়েছিলাম। রেতে হিম পড়ে সব নেতিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা ছাদে? অনেককেই খোশামোদ করলাম, কেউ সঙ্গে গেলো না। এদিকে না আনলে ঠাকমা চটবেন। শাড়ির আঁচলে বাঁধা পয়সা থেকে আধপয়সা দেবেন না ঘুড়ি কিনতে! পা টিপে টিপে রামসীতা, সীতারাম বলতে বলতে যেই ছাদে যাবার দরজা খুলেছি অমনি দেখি ট্যাকের উপর মুখুজোমশাই



প্রভু তোর পেছু নেবে না, এখানে থাকবে।
বসে। সেই বকম বেশভূষা! আমাকে দেখে বুটজুতো পরা লিকলিকে
পা দুটো দোলাতে দোলাতে খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললেন,
এ্যাঁই, তোর মুখজো ঠাকুমাকে বল আমার কঁকড়া দিতে।

কথাটা শুনে আমার বুক টিপটিপ করতে শুরু করলো। তখনও
অজ্ঞান হইনি। মুখজোমশাই তেমনিভাবে হাসতে হাসতে বললেন,

কঁকড়া না খেয়ে আমি যাচ্ছি নে। আর তোর মুখজো ঠাকুমাকে
বল যমের খাতায় নাম দেবেছি, এইবার যেতে হবে। এইসব
দেখে আমি তো অজ্ঞান! আমার গোঁ গোঁ ডাক শুনে ঠাকমা
হাসে এলেন। তারপর আর অবশ্য মুখজোমশাইকে দেখিনি, বা
শুনিনি কঁকড়া খেতে চাওয়া। তবে তাঁর কথাটা যদি মিথ্যে
হবে তাহলে সাত দিন পরই মুখজো ঠাকমা ছড়া তেঁতুলের আচার
করতে করতে পরপারে যাবেন কেন?

সে যাকগে, আমি যে রামতীতু আর অহরহ দিনে দুপুরে
ভূতের ভয় পাই রশিদ জেনে গেলো। কিন্তু জানলেও কখনও
আমাকে ভয় দেখায়নি।

একদিন রাত্রে অঘোরে ঘুমচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম রশিদ
রেগে-মেগে বলছে, যা যা....ভাগ ভাগ। কী চাস তুই? আমি
ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রশিদ কার সঙ্গে কথা বলছে? আমাকে
উঠে বসে থাকতে দেখে রশিদ বলল, বিদ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম
রে! শুয়ে পড়। আমি চুপচাপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ
রশিদ বলল, এই, তুই ভূত বিশ্বাস করিস? আমি ওকে অনেক
আগেই মুখজোমশাইয়ের কথা বলেছি।

চুপ করে রইলাম। গভীর রাতে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে,
ঝড়ো হাওয়াতে গাছগুলো দুলছে আর তারই সাঁ-সাঁ অদ্ভুত শব্দ
ভেসে আসছে। সেই পরিবেশে কে আবার ভূতের কথা আলোচনা
করতে চায়! রশিদ ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, একটা কন্দকাটা
ভূত আমাকে প্রায়ই রাতে ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে চোখ গোলা
গোলা করে বড়ই শাসাচ্ছে।

শাসাচ্ছে? কেন তুই কি করেছিস? ভয়ে ভয়ে বললাম।

গত মাসে বিজুরে ফুটবল খেলতে গেছিলাম। খুব ঘামি বলে
ডাক্তার বলেছিলো মাঠে নামার আগে চার-পাঁচ গেলাস পানি
খেতে। আমি খেয়ে মাঠে গেছি, এমন সময়ে দারুণ বাতরুম
পেলো। এদিকে রেফারী তিনটে হুইসিল মেরেছে। সময় নেই
দেখে খেলার মাঠের একটু পাশে নিমগাছ তলায় একটা ভাঙা
ভাঙা বেদি আছে, সেখানে....নিমগাছের পাশেই যে কবরস্থান
আমার জানা ছিলো না। তারপর থেকেই রোজ রাতে আমার
কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলে, এই বদমাশ, তুই আমার
কবরের এলাকা নোংরা করেছিস কেন? তাকে মজা দেখাবো।
বিদ্রী খনখনে গলায় ধমকায়, ঠেলা মারে। চোখ খুলে দেখি
একটা আলখাল্লা পরা মুণ্ডু নেই ছায়া ছায়া মতন পাশে দাঁড়িয়ে।
আমায় যেন খেয়ে ফেলবে। তারপর আমি হটহট করলেই তোর
মাথার কাছের জানালা দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়।

সত্যি? আমার গলা শুকিয়ে গেছে। ঠাণ্ডাতে ঘামছি।

রশিদ বলল, ভয় আমি পাই না। তবে রোজ রোজ এসে
কন্দকাটাটা ভয় দেখালে বিরক্তি লাগে। তাছাড়া আরও কিছু
ফুসফুস করে বলে, বুঝতে পারি না।

আমি বললাম, পিণ্ডি-টিণ্ডি দিলে হয় না?

ধ্যাৎ, মুসলমান ভূতের পিণ্ডি হয়? অনেকটা সময় চূপ থেকে বলল, ভাবছি হরিহর তান্ত্রিকের কাছে গেলে কেমন হয়? শুনেছি ভূতদের মুঠোর মধ্যে ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন। নট ছাড়নছাড়ন নট কিচ্ছু।

তারপর থেকেই ছায়ার মতো রশিদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। রাতে ঘুমোতে পারি না। সব সময় মনে হয় রশিদের স্বপ্নকাটা প্রেত আমার চারপাশে ঘুরছে। ফিসফিস করছে। সঙ্গে আবার কাকড়া খেতে-চাওয়া মুখজ্যোমশাই। গাছগুলোর দিকে তাকাতে পারি না। পাকা পাকা বেলভর্তি বেলগাছের দিকে তো নয়ই। বোম্বেষ্টে মাস্টারমশাই বলেছে, ওই বেলগাছে বেহ্মদতি থাকেন। পণ্ডিতমশাই স্কুলকে বড় ভালবাসতেন। মরে গিয়েও হাড়তে পারছেন না। স্বচক্ষে দেখেছেন বেহ্মদতি পণ্ডিতমশাই সাদা থান আর খড়ম পায়ে খট খট খট করে উঠোনে ঘুরে বেড়ান। যে ওই গাছের বেল খেয়েছে সে তিন রাত পোয়াতে না পোয়াতেই পটল তুলেছে। কাকাকেও বলতে পারি না। অঙ্ক মাথায় ঢোকে না। $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, তাও ভুলে যাচ্ছি।

এমন যখন অবস্থা, রশিদ বলল, বুঝলি আজ তান্ত্রিকের কাছে গেছলাম। কথা কইবো কি, দেখলেই ভয় লাগে। ইয়া লম্বা এক-মুখ দাড়িগোঁফ। লম্বা লম্বা কটা চুল। চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। সারা দেহে রক্তচন্দন। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা আর বেড়ালের মুণ্ডুর হার। হাতে তামার বালা। আশে পাশে কমসে কম দেড় ডজন কালো কুকুর আর বেড়াল! সামনে স্থলছে আগুন, কে জানে কিসের। বিকট গন্ধ আর ধোঁয়া! সর্বদাই দাঁত কিড়মিড় করছে আর চিৎকার করছে, ভাগ ভাগ সব শকুনের দল। এমন শাস্তি দেবো যে বুঝবি। বলছে আর আগুন থেকে গরম ছাই তুলে ছুঁড়েছে। আমি বললাম সব কথা। আমার কথা শুনে হরিহর তান্ত্রিক বলল, হতভাগা, তোকে আর বলতে হবে না। তোর পেছনেই গফুর আলির মুণ্ডুহীন প্রেত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুই ওকে অসন্তুষ্ট করেছিস। ও তোর হাতে পানি খেতে চায়।

ভূতে পানি খাবে?

রশিদ বলল, হ্যাঁ, তাই তো বলল।

আমি রশিদের পিছনের দিকে পিটপিট করে তাকলাম। কে জানে গফুর আলির স্বপ্নকাটা প্রেত দাঁড়িয়ে নেই তো?

রশিদ বলে চলেছে, আমার সব কথা শুনে বলল, ঠিক আছে, বোটাকে জন্ম করবো। তার আগে ও যা চাইছে তাই দে। তুই এক গেলাস পানি চা-এর প্যাকেটের রাঙতা দিয়ে মুড়ে পাঁচটা শক্তিগড়ের ল্যাংচা, পাঁচটা বোমা (গোল গোল বোম্বাস্টিক ঝাল আলুর চপ), পাঁচ সিকে পয়সা ব্যাটার কবরে রেখে পাঁচটা ধূপ জ্বালে বলবি—গফুর সাহেব, জল দিলাম। পান করে তৃপ্ত হও। এই বলে সব জিনিস কবরে রাখবি। যে সে দিন নয়, শনিবার অমাবস্যাতে। তারপর কবরের পাশে শুবি।

বইমেলায় বেরিয়েছে



পাচটি ছেলেমেয়ের দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ পাতায় পাতায় রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা বইটি ছোটবড় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। ছোটদের হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দেবার মতো সুন্দর একটি উপহার।

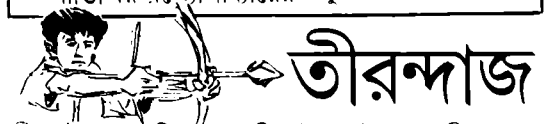
এই সিরিজের প্রথম বই

কেল্লা রহস্য

গত বইমেলায় বইটি বেরবার সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তুলেছে। মিউ, মোমা, বুয়া, বাবু, রাজা আর কাকাতুয়া কিকি এখন ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণের বন্ধু।



শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধরনের উপন্যাস



তীর ছোঁড়া প্রাকটিক করতে গিয়ে টারগেটের ওপর দিকে চোখ পড়তেই ছোট ছেলেটি ভয়ে কেঁপে উঠলো। পরিষ্কার দেখলো ভূতটাকে। ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর তারপরই... রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা শিহরন জাগানো একটি নতুন ধরনের উপন্যাস। যা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামার জো নেই।



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

সকালে উঠে যদি দেখিস একটা কালো বেড়াল আর কুকুর ল্যাংচা আর বোমা খাচ্ছে আর গেলাস রাঙতা মোড়া অথচ জল নেই তখন জানবি ব্যাটা জল খেয়েছে। বাস, বাকী যা করার আমি করবো। আর তোর ভয় নেই।

না, রশিদের পেছনে কেউ নেই। দেওয়ালে বিরাট একটা মাকড়সা জাল বুনে চলেছে।

শনিবার অমাবস্যা। রাত বারোটা। আমরা দুজনে বৃষ্টির জলের নল বেয়ে নিচে নেমে চললাম কবরস্থানের আর শ্মশানের লাগোয়া অন্ধখ গাছতলায় ডেরাবাধা হরিহর তান্ত্রিকের বাড়ি। রশিদের মুখ গম্ভীর। হাতে ঠোঙ্গাতে ল্যাংচা, ধূপ, গেলাস আর বোমা। আমি তো রাম রাম সীতারাম সীতারাম মনে মনে বলতে বলতে চলেছি। রশিদ কি বলছে জানি না।

রশিদ তান্ত্রিক হরিহরের যা বর্ণনা দিয়েছিলো, সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম তার চেয়ে আরও বেশি ভয়াল ভয়ঙ্কর! তান্ত্রিকের চোখ আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরছে। সামনে আগুন জ্বলছে। কে জানে কি পোড়াচ্ছে! বীভৎস তার গন্ধ আর ঘোঁয়া। কালো কালো কুকুর আর বেড়াল আমাদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলো। হরিহর তান্ত্রিক একমুঠো গরম হাই ওদের দিকে ছুঁড়ে বলল, এও শয়তান, শাস্ত হো যা। বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর-বেড়ালগুলো শাস্ত হয়ে গেলো। হরিহর তান্ত্রিক রশিদকে দেখে বলল, এসে গেছিস? ভালই। ব্যাটা তোর পিছনেই তো গলাকাটা গফুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাটা মুণ্ডুটা পাশেই জিত বার করে ধুকছে।

রশিদ জিনিসগুলো হরিহর তান্ত্রিকের পায়ের কাছে রেখে অর্ধনিম্নলিত চোখে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

যা পুকুরে যেয়ে জল আন গেলাস ভর্তি করে। ভয় নেই, গফুরের প্রেত তোর পেছ নেবে না, এখানে থাকবে। রশিদ চলে গেলে হরিহর তান্ত্রিক হঠাৎ বিকটভাবে হেসে একগাদা হাই আমার দিকে ছুঁড়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, তুই কে রে? তোর ঘাড়ে দেখি বুটজুতো পরা বামুন ভূত! দাঁত খিঁচুনো বার করছি। ব্যাটার কি লোভ! কাঁকড়া খেতে চায়? আয় ইদিকে, আয় বলছি।

অবস্থা বুঝতেই পারছো তো আমার। প্রায় মরে গেছি। তান্ত্রিক এতো কথা জানলো কেমন করে?

হরিহর তান্ত্রিক আবার সেই রকম বিকটভাবে হেসে আমার একটা হাত খপ করে ধরে ফিসফিস করে বলল, বামুন প্রেতটা তোকে কিছু বলে? এই রাতে, বাথরুমে, শেওড়া গাছ থেকে? বল, বল, বলে ফেল।...যাঃ বলতে হবে না।

উত্তর দেবো কী? কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার গলা চেপে ধরেছে। সত্যি তো হরিহর তান্ত্রিক ভূত ধরে, তা না হলে মুখুজ্যেশাইকে জানবে কেমন করে?

তারপর হরিহর তান্ত্রিক আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, যাঃ, তোর ভয় নেই। তবে তুই রোজ শোবার সময় বেটাকে

জল দিবি। রোজ রাতে মাথার তলায় একটা কাগজে সীতারাম লিখে রাখবি। আর এক গেলাস জল রাখবি। বেটার গতি কোনোদিনই হবে না। পিণ্ডি দিলেও না। লালসা নিয়ে মরেছে যে। হাঃ হাঃ হাঃ। আকাশ-ফাটানো হাসি।

রশিদ এসে গেলো। আমি কাঁপতে কাঁপতে ওর সঙ্গে তয়ত্ত্বের মধ্য দিয়ে একটা ভাঙা কবরের সামনে এলাম। অমাবস্যা, চারিদিক অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলো মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নানা রকমের ভূত। হঠাৎ হঠাৎ শেয়াল ডাকছে। কুকুরে কুকুরে লড়াই করছে। পেঁচা ছুটোছুটি করছে। অদূরে শ্মশানে কারা যেন এসেছে। তারা আত্মার সদগতির জন্য বিকটভাবে হরিবোল হরিবোল করছে!

রশিদ নিষ্ঠার সঙ্গে ল্যাংচা, ধূপ, গেলাসভর্তি জল, বোমা, পাঁচ সিকে, ভাঙা কবরের উপর রেখে বলল, গফুর সাহেব, অন্যায় হয়ে গেছে। পানি খেয়ে শান্ত হও। তারপর টেসের চায়ের প্যাকেটের মোটা রাঙতাটা দিয়ে জলভর্তি গেলাসের মুখটা মুড়ে কবরের পাশে চোখে হাত দিয়ে শুয়ে বলল, ঘুমো।

আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত জানি না, হঠাৎ কানে এলো বিকট গোঁ গোঁ শব্দ! চোখ খুলে দেখি রশিদ কাটা ছাগলের মতো কবরের পাশে ছটফট করছে। ওকে ঠেলতে লাগলাম, রশিদ, রশিদ! কোথা থেকে একটা কালো কুকুর এসে ল্যাংচা আর বোমাগুলো খেতে লাগলো। খাওয়া হলোই অদৃশ্য হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে রশিদ চোখ খুলে গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বলল, পিয়ে গেছে, পানি পিয়ে গেছে।

গেলাসটা শূন্য! কে খেলো? রাঙতা তো অটুট!

ভালো করে সকাল হয়নি। আমি আর রশিদ দৌড়তে দৌড়তে বোড়িংয়ে ফিরলাম। সকলে তখনো ঘুমোচ্ছে।

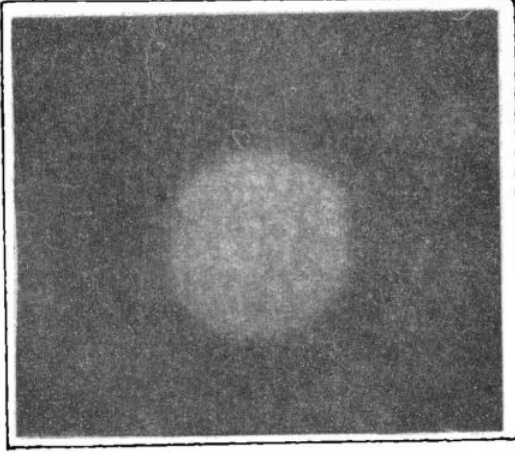
বিশ্বাস করো তারপর থেকে সব নর্মাল। রশিদের কানের কাছে কেউ আর ফিসফাস করে না। ছায়াও সে দেখে না। আশ্চর্য! আমারও ভূতের ভয় কেটে গেলো সেই থেকে।

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য



বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন



ইউরেনাসের বলয়

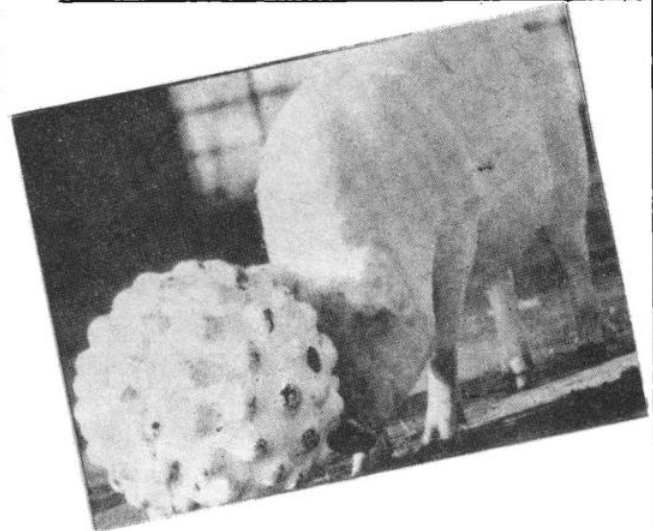
বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম তাঁর দূরবীন দিয়ে দেখেন শনি গ্রহের গা ঘেঁষে দুটো অল্পত জিনিস। ক্রমশ তারা ছোট হতে হতে এক সময়ে মিলিয়ে যায়। ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে হয়গেনস নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কথা শুনে গ্রহটিকে ভালো করে দেখে বললেন, শনিকে ঘিরে তার একটু তফাতে একটা চ্যাপ্টা বালার মতো আছে। অন্য কোনো গ্রহের এরকমটি নেই। পরে আরো ভালো দূরবীন দিয়ে দেখা গেল একটা নয় তিন তিনটে চাকা, একটার ভেতর আরেকটা শনিকে মাঝখানে রেখে বলয়ের মতো ঘুরছে। এটাই শনির বলয়। শনির ব্যাস ৭৫,০০০ মাইল। এই চাকা তিনটি নিয়ে তার ব্যাস ১৭১,০০০ মাইল। হার্শেল আবিষ্কৃত ইউরেনাসের ব্যাস ৩১,০০০ মাইল। সূর্য থেকে ইউরেনাস ১৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল দূরে। ভীষণ ঠাণ্ডা এই গ্রহ। এর পাঁচটি চাঁদ বা উপগ্রহ আছে। শনির আছে দুটি উপগ্রহ বা চাঁদ। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্যের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের বলয় আছে একথা বললেও তার কোনো প্রামাণ্য তথ্য ছিল না। কিন্তু টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা ইউরেনাসের ছবি এই তথ্যের প্রমাণ দিয়েছে। ছবির মধ্যের অংশ ইউরেনাস গ্রহ। তাকে ঘিরে তার বলয়।

ফুটবল খেলবে শুয়াররা

শুয়ারে ফুটবল খেলছে শুনলেই চোখ বড় বড় করে তোমরা নির্ঘাত জিগ্যোস করবে, সে আবার হয় নাকি! এ তো দেখছি সিংহকে ঘাস খেতে দেওয়ার মতো ব্যাপার। তাহলে বলি শোন এই অসাধ্যসাধন করেছেন এডিনবার্গের স্কটিশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। অনেক দিন ধরে তাঁরা পোষা প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেই সময় তাঁরা দেখেন মানুষের মতো প্রাণীদেরও মনের অসুখ হয়। অসুখ হলে তারা শারীরিকভাবে

দুর্বল হয়ে পড়ে। নেতিয়ে শুয়ে থাকে, নয়তো স্বভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে। পিগারী, পোলট্রি, ডেয়ারী যেখানে দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদনের জন্য শুয়ার, মুরগী ও গরু পালন করা হয় সেখানে দেখা গেল মানসিক অসুখের জন্য প্রাণীরা দুর্বল হয়ে গেলে উৎপাদনও ঠিক হয় না। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। পিগারীর পোষা শুয়ারদের পা ক্রমশ শুরু হয়ে যায়, গায়ে ব্যথা হয়। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন পিগারীর পোষা শুয়ারগুলো মুখের কাছে খাবার পায় বলে দৌড়কাঁপ করে না, সারাদিন বসে বসে শুধু খাবার চিবোয়। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে গোঁতাগুঁতি করা ছাড়া আর বেশি শারীরিক পরিশ্রম এরা করে না। অন্যদিকে বুনো শুয়ারদের পা সুরু হয় না বা গা ব্যথার মতো অসুখ হয় না। কারণ তারা সারাদিন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করে খাবার যোগাড় করে।

এসব কথা চিন্তা করেই বিজ্ঞানীরা শুয়ারদের জন্য তৈরি করেছেন বিশেষ ধরনের ফুটবল। এই বলগুলো শুয়ারদের সামনে রেখে দেওয়া হয়। বলগুলোতে ছিদ্র থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে শুয়ারদের প্রিয় খাবার। প্রথম প্রথম দূর থেকে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলার মাধ্যমে বলগুলো গড়ানো হয়। গড়ালেই খাবার বেরিয়ে আসে। শুয়ারগুলো কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে বল থামলেই খাবারও বন্ধ হয়ে যায়। খাবার বার করতে তখন তারা নিজেরাই বলগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যায়। এ সময়ে অন্য কোথাও তাদের জন্য খাবার রাখা হয় না। ফ্রিদের জ্বালায় বাধ্য হয়ে তাই তারা বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এভাবেই তাদের দিয়ে ব্যায়াম করানোর ব্যবস্থা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তার ফলও পেয়েছেন হাতে হাতে। যেসব শুয়াররা ফুটবল খেলে তারা খিমেয় না। তাদের মনের অসুখও হয় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন চিড়িয়াখানাতে বিভিন্ন প্রাণীদের জন্য এবং পোষা কুকুর বেড়ালদের জন্যও এরকম ব্যবস্থা রাখা উচিত।





বেদগাঁওয়ের সেই যুদ্ধ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সীমান্ত রক্ষী ও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে। এই সেনাদলের তিনটি শাখা—স্থল, জল এবং বিমান বাহিনী। স্বাধীন ভারতের সেনাদলকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধেই অসাধারণ বীরত্ব, রণকৌশল এবং চরম আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন ভারতের নির্ভীক সন্তানরা। সারা দেশ তাঁদের জন্য গর্বিত। এই বিভাগে এমনই কয়েকজন মরণঞ্জয়ী সৈনিকের রোমাঞ্চকর যুদ্ধকাহিনী পরিবেশিত হবে।]

বীপ বীপ বীপ হ্যালো — ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার? হ্যালো...বেদগাঁও বেসপয়েন্ট থেকে মেজর সোমনাথ শর্মা বলছি....হ্যালো....শত্রু পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে....তারা সংখ্যায় অনেক....জলদি আরও দু কোম্পানী সৈন্য পাঠান....তবে সংখ্যায় আমরা যত কমই হই না কেন, আমি শপথ করছি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবো। মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমিও আমরা হানাদার শত্রুর হাতে তুলে দেব না....কখনোই না.....

মেজর সোমনাথ শর্মার পাঠানো ওয়্যারলেস বার্তা এই পর্যন্ত শুনতে পেলেন ব্রিগেডিয়ার সেন। তারপরই এক ভয়ঙ্কর বিশ্ফোরণের শব্দ। ওয়্যারলেসের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

ব্রিগেডিয়ার সেন আর দেরি করলেন না। তক্ষুণি দু কোম্পানী সৈন্য রওনা করে দিলেন বেদগাঁও বেসপয়েন্ট অভিমুখে।

জায়গাটা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাই তার সামরিক গুরুত্ব অপরিমীম। কারণ শ্রীনগর হলো ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগের একটা বড় কেন্দ্র। আর সেটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে হানাদার শত্রুরা।

ওরা যে এত চটপট বেদগাঁও-এ পৌঁছে যাবে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ বোধহয় ভাবতে পারেননি। সেখানে শত্রুর মোকাবিলায় হাজির ছিল কুমায়ুন রেজিমেন্টের মাত্র দু কোম্পানী সৈন্য। তাদের

দলপতি মেজর সোমনাথ শর্মা। প্রাণচঞ্চল দুঃসাহসী এক তরুণ।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভারত স্বাধীন হবার মাস কয়েক বাদে। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান হঠাৎ হাজার হাজার হানাদার পাঠাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য গোটা কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। অগত্যা কাশ্মীরকে হানাদারমুক্ত করতে ভারত সরকারও ফৌজ পাঠাল। শ্রীনগর বিমানবন্দরে গিয়ে নামলো ভারতীয় বাহিনী।

হানাদাররা তখন চারটি দলে ভাগ হয়ে মুজঃফরাবাদের পথ ধরে এগিয়ে আসছে শ্রীনগর আর জম্মুর দিকে। তারা সবাই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওদের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী পাকিস্তানী সেনাদল।

প্রথম চোটে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানী হানাদাররা কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অত্যাচার আর নৃশংসতার চিহ্ন ছড়াতে ছড়াতে হিংস্র নেকড়ের মতো ছুটে আসছিল ওরা। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ শহর বারমুলাও তারা দখল করে ফেললো। ততক্ষণে অবশ্য ব্রিগেডিয়ার সেনের নেতৃত্বে ১৬১ নম্বর পদাতিক ব্রিগেড শ্রীনগরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

পাকিস্তানী হানাদাররাও ধূর্ততায় কম যায় না। তারা এবার সম্মুখ যুদ্ধের পথ ছেড়ে গেরিলা কায়দা ধরলো অর্থাৎ গা ঢাকা দিয়ে রইলো আশপাশের গ্রামগুলিতে এবং মাঝে মাঝে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ভারতীয় বাহিনীর ওপর।

এমনই একদল হানাদার লুকিয়েছিল বেদগাঁও গ্রামে। ওদের মতলব ছিল হঠাৎ চড়াও হয়ে শ্রীনগর বিমানবন্দরটা দখল করে



নেবে। আর তা যদি করা যায় তাহলে পুরো কাশ্মীরের দখল নিতে আর কতক্ষণ ?

মতলবটা যদি সত্যিই তারা হাসিল করতে পারতো তবে আজ ছয়তো কাশ্মীর থাকতো পাকিস্তানেরই দখলে। কিন্তু ভারতের এক বীর সৈনিক মেজর সোমনাথ শর্মা তা হতে দেননি। ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন শত্রুশক্তির চক্রান্ত।

মেজর সোমনাথ শর্মা যে বংশের সন্তান সেই বংশ পুরুষানুক্রমে বহন করে চলেছে সৈনিকের মহান দায়িত্ব। মেজর শর্মার বাবা মেজর জেনারেল এ. এন. শর্মা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সোমনাথ উপযুক্ত পিতার সুযোগ্য পুত্র।

৪ নম্বর কুমায়ুন রেজিমেন্টের এই মেজর কিন্তু সে সময়ে শারীরিক ভাবে খুব একটা সুস্থ ছিলেন না। দিন কয়েক আগে ক্লাবের মাঠে হকি খেলতে গিয়ে বাঁ হাত ভেঙে যায়। হাতে তখনও প্রাস্টার বাঁধা। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যতদিন না হাতের প্রাস্টার খোলা হয় ততদিন তিনি যেন দিল্লীতে বিশ্রাম করেন।

মেজর শর্মা অবশ্য ডাক্তারের এই উপদেশ মানেননি। কারণ ওদিকে কাশ্মীরে তখন বিদেশী হানাদাররা ঢুকে পড়েছে। মোকাবিলায় ডাক পড়েছে তাঁর কুমায়ুন রেজিমেন্টের। এ সময়ে দলনায়ক সঙ্গে না থাকলে কে ভরসা দেবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে ? অতএব বাঁ হাতে প্রাস্টার বাঁধা অবস্থাতেই মেজর সোমনাথ শর্মা হাজির হয়েছিলেন শ্রীনগর ফ্রন্টে।

১৯৪৭ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার সেনের নির্দেশে কুমায়ুন রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ানের প্রায় একশো সৈন্য নিয়ে মেজর শর্মা বেদগাঁও থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দরে যাবার পথে একটা উঁচু জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। দুপুর দুটো নাগাদ শ্রীনগরের মূল ক্যাম্পে বসে ব্রিগেডিয়ার সেন মেজর শর্মার ওয়ারলেস বার্তা পেলেন। মেজর জানালেন, হানাদাররা বেদগাঁওয়ের বাড়িগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু তিনি সেভাবে পাশ্টা জবাব দিতে পারছেন না। কারণ, গ্রামের নিরীহ মহিলা আর শিশুরা তাহলে মারা পড়বে। ব্রিগেডিয়ার



সেন জানতেন, নিতীক ও রণকুশলী এই সেনানায়কের হৃদয়টি বড় কোমল।

মেজর শর্মা বার্তা পাঠাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় সাতশো হানাদার সৈন্যের একটা দল গ্রাম থেকে বেরিয়ে কুমায়ুন রেজিমেন্টের একশো জওয়ানকে তিন দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করলো। সংখ্যায় তারা ভারতীয় বাহিনীর সাত গুণ। হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র। তারা আসছে ঢেউয়ের মতো। তবু পেছিয়ে গেলেন না মেজর সোমনাথ শর্মা। সাতের বিরুদ্ধে একজন সৈন্য নিয়েও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

ডাঙা হাতের যন্ত্রণা, জীবনের ভয়—সব কিছু তুচ্ছ করে শত্রুর প্রায় মুখোমুখি পৌঁছে লড়াই শুরু করলেন মেজর শর্মা। তাঁর অসাধারণ বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে লড়তে লাগলো অধীনস্থ সেনারা। এদের মধ্যে মেজর শর্মা একাই একশো সেনার সমকক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন সমস্ত রণক্ষেত্র জুড়ে। শুধু কি তাই? অধীনস্থ সৈন্যদের অস্ত্রগুলিতে বারুদ যোগান দেবার দায়িত্বও নিলেন নিজেই। এমনকি কোনো পোস্টে কোনো সৈন্য নিহত হলে তার জায়গায় পৌঁছে নিজেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে লাগলেন।

প্রায় ছ ঘণ্টা ধরে চললো এই মরণপণ যুদ্ধ। মেজর শর্মার উদ্দেশ্য ছিল সাহায্যকারী সেনা না আসা পর্যন্ত যেভাবে হোক হানাদারদের আটকে রাখা। তা তিনি শেরেছিলেন। কিন্তু ছ ঘণ্টা বাদে ভারতীয় সেনারা যখন এসে পৌঁছলো, তার কিছুক্ষণ আগেই শত্রুশক্তির মর্টার থেকে ছুটে আসা গোলার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই বীর সৈনিক।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবসে মেজর সোমনাথ শর্মাকে মরণোত্তর পরমবীর চক্র সম্মানিত করা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে এ সম্মান তিনিই প্রথম লাভ করেছিলেন। মাতৃভূমির গৌরবরক্ষায় তাঁর আত্মদানের কাহিনী চিরকাল লেখা থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে।

সরাসরি অফিসার হবার পরীক্ষা

কতারা বন্ধুরা, আগের সংখ্যায় তোমরা পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ডব্লিউ. বি. সি. এস পরীক্ষা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পেরেছ। এবার পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বিষয়ে তোমাদের জানাব। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের লক্ষ্য চাকরি করা। স্নাতক হওয়ার পর একটু পরিশ্রম করে যদি মিসসেল্যানিয়াস সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায় তাহলে সফলতাল্লাভ করার পর সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়ার অফিসার পদে চাকরিতে যোগদান করা সম্ভব হয়।

মিসসেল্যানিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যেসব আকর্ষণীয় পদে চাকরি পাওয়া সম্ভব সে বিষয়ে তোমাদের একটু জেনে রাখা দরকার। ভাল চাকরিতে যোগ দিয়ে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করার আনন্দই আলাদা! এই পরীক্ষার মাধ্যমে ইমপেটর অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার, ইমপেটর অব রিলিফ, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট লেবার সার্ভিস, ইমপেটর - এগ্রিকালচারাল

৩০ বছরের মধ্যে। তফশিলী জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়সের ছাড় দেওয়া হবে; দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৪৫ বছর। সাব-ইমপেটর অব এক্সাইজ পদের বেলায় দৈহিক পরিমাপের একটা ব্যাপার আছে। কেননা এই পদে চাকরির ক্ষেত্রে দৈহিক সুস্থতা, দৌড়-ঝাঁপের ব্যাপার রয়েছে। এই পদের জন্য প্রার্থীকে কমপক্ষে ১৬০ সেন্টিমিটার লম্বা হতে হবে। বুকের ছাতি সম্প্রসারণ করার পর ৭৬ সেন্টিমিটার হতে হবে। বুকের ছাতি কমপক্ষে ৫ সেন্টিমিটার সম্প্রসারিত করতে পারা চাই। গোষ্ঠী, গাড়োয়াল, অসমীয়া, তফশিলী আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উচ্চতার পরিমাণ ৭.৬ পর্যন্ত কম করা হবে।

পরীক্ষার বিষয়ঃ এই পরীক্ষার তিনটি কম্পালসারি পেপারে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। আর লিখিত পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর দিতে হয় পার্সোনালিটি টেস্ট। প্রথম পেপারে থাকে ইংরাজি, দ্বিতীয় পেপারে থাকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি (যে যার পছন্দ মতো বেছে নেবে তার মাতৃভাষা অনুসারে)। এই দুটি পেপারের পরীক্ষার সময় প্রতি পেপার পিছু দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া যায় এবং পূর্ণমান পেপার পিছু দেড়শো নম্বর। তৃতীয় পেপারে থাকে জেনারেল স্টাডিজ এবং অ্যারিথমেটিক। দুশো

ভবিষ্যতের ঠিকানা

ডি. এ. চন্দ্রণ

ইনকাম ট্যাক্স, ইমপেটর অব এনটি ট্যাক্স, সাব-ইমপেটর অব এক্সাইজ, ইমপেটর অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, অডিটর অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিটর (বোর্ড অব রেভিনিউ), ডেপুটি জেলার, সাব-জেলার প্রভৃতি পদে সরাসরি নিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়। আর বেতনক্রমও অপরূপ হবার মতো নয়। প্রথম তিনটি পদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম ১৩৯০ টাকা থেকে ২৯৭০ টাকা; চতুর্থ পদ থেকে দ্বাদশ পদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম ১২৬০ টাকা থেকে ২৬১০ টাকা; এবং শেষোক্ত পদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম ১২০০ টাকা থেকে ২৩৬০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া সরকারি নিয়ম অনুসারে অন্যান্য ভাতা তো পাওয়া যাবেই। তফশিলী জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের জন্য কয়েকটি পদ সংরক্ষিত রাখা হয়, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও কয়েকটি পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। সব পদেই মেয়েরা বিবেচিত হতে পারে, কেবলমাত্র সাব-ইমপেটর অব এক্সাইজ পদের ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থীপদ বিবেচিত হয় না।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ কত দূর লেখাপড়া জানা থাকলে এই পরীক্ষায় বসা যায় এ কথা জানার জন্য মনটা কেমন উসখুস করছে, না? করবেই তো। এই পরীক্ষায় বসতে হলে কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। আর প্রার্থী যে বছর এই পরীক্ষায় বসবে সেই বছরের ১ জানুয়ারি তারিখের হিসাবে তার বয়স হতে হবে ২০ থেকে

নম্বরের পরীক্ষা। সময় এই পেপারের ক্ষেত্রে দু ঘণ্টা। দুটি গ্রুপে ভাগ করে এই পেপারের প্রশ্ন করা হয়। গ্রুপ 'এ'তে থাকে জেনারেল স্টাডিজ ও গ্রুপ 'বি'তে থাকে অ্যারিথমেটিক। প্রত্যেক গ্রুপে একশো নম্বরের প্রশ্ন থাকে।

এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড কি রকম হবে? খুব কঠিন? এ প্রশ্নে বলে রাখি, প্রথম ও দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষার মান হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মানের মতো এবং প্রশ্নের ধরনও হবে গতানুগতিক টাইপের। যেমন—কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করা থাকে, সেই সব পয়েন্ট অনুসরণ করে একটা ড্রাফটিং করতে হয়; বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করতে দেওয়া হয় (প্রথম পেপারের ক্ষেত্রে)। আবার দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষায় ইংরাজি থেকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি (যার যেমন) ভাষায় রি-ট্রান্সলেশন করতে বলা হয়। এছাড়া থাকে গদ্যাংশকে ছোট করে লেখা (প্রেসি/সামারি), ইউজ অব ওয়ার্ডস অ্যান্ড কমন ফ্রেজেস, কারেকশন অব সেনটেন্সেস, সিনোনিমস, অ্যান্টোনিমস ইত্যাদি। দ্বিতীয় পেপারে ব্যাকরণ অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয়। মনে রাখবে এই দুটি পেপারের পরীক্ষা কিন্তু আমাদের বোর্ড বা ইউনিভার্সিটির মতোই সাবজেক্টিভ মেথডে লিখতে হয় কিন্তু তৃতীয় পেপারের পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয় অবজেক্টিভ টাইপের। জেনারেল স্টাডিজ অর্থাৎ 'এ' গ্রুপের সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নে বিজ্ঞান বিষয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিষয়ে,

ভারতের সাম্প্রতিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন, ভারতের ইতিহাস, ভারতের ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অবজ্ঞেষ্টিত ধরনের প্রশ্ন করা হয়। গ্রুপ 'বি'তে আবিথমেটিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নের মান মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো। সবশেষে, পার্সোনিয়ালিটি টেস্টে থাকে একশো নম্বর। যেসব প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার মেধা তালিকার ভিত্তিতে সফল হয় শুধু তাদেরই পার্সোনিয়ালিটি টেস্টের জন্য ডাকা হয়। তবে কমিশন কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে কিংবা এগ্রিগেট নম্বরের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং নম্বর ঠিক করে দিতে পারে। তফশিলী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সেই নম্বরে ছাড় দেওয়া হতে পারে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়ম: কোনো প্রার্থী তিনবারের বেশি এই পরীক্ষায় বসতে পারে না। তবে তফশিলী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকরী নয়। তফশিলী প্রার্থীদের বিভিন্ন ছাড়ের সুযোগ নিতে হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া বৈধ জাতিগত সার্টিফিকেট থাকা চাই। কোনো ক্ষেত্রেই অন্য সাহায্যকারী (ক্লাইব) নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। পার্সোনিয়ালিটি টেস্টের আগে সব প্রার্থীর সার্টিফিকেট ইত্যাদি যাচাই করে নেওয়া হয়।

আবেদনের পদ্ধতি: সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ সংবাদপত্রে এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মে মাস নাগাদ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্দিষ্ট প্রো-ফর্ম অনুসারে দরখাস্ত করতে হয়। সঙ্গে দিতে হয় সাম্প্রতিক কালের দু'কপি ফটোগ্রাফ, বিভিন্ন সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল ইত্যাদি। পরীক্ষা সম্পর্কিত আবেদনপত্র ও অন্যান্য বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস ১৬১ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানায়।

প্রস্তুতি: পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব কীভাবে এ প্রশ্ন সবার মনে। আগের দশ বছরের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে প্রশ্নের ধরনধারণ দেখে নিতে হবে। পরীক্ষা প্রস্তুতি সহায়িকাও বেরিয়েছে প্রচুর। উচ্চমাধ্যমিকের ইংরাজি গ্রামার ও কম্পোজিশনের বই, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বিচিন্তা অনুসরণ করে প্রস্তুতি নিতে হবে। গণিতের জন্য মাধ্যমিকের বই দেখে অনুশীলন করলেই হবে। এছাড়া যোজ্যবর নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণও নেওয়া যেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য সিরিয়াসলি পড়তে হবে, ফাঁকিবাঁজিতে ক্ষতি কিন্তু নিজেদেরই।



জানো কী



□ চুরিতেই ঘেন্না ধরে গেল সিদেল চোর জটাধরের। কেন? কি হলো তারপর?



- সন্ধ্যাবেলা বনের মধ্যে দিয়ে একা একা বাড়ি ফিরতে বড় ভয় লাগে গোপালের। সাহস দিয়ে মা বললেন, বনে তো আমার আরেক ছেলে থাকে। ভয় পেলে তাকে ডাকবে। পরদিন সেই বনের পথে যেতে যেতেই...কি করল গোপাল?
- অন্ধের ভয়ে বাড়ি থেকে নিকরদেশ হয়ে গেছিলেন বন্ধুবিসহারা। তিন মাস পর যখন ফিরলেন, তখন... সে এক আজব কাণ্ড...
- বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন দুটি অভিনব অস্ত্র। একটি রুখবে মৃত্তিকা-দূষণ, অন্যটি ম্যালিগনান্ট টিউমার। কি জাতীয় অস্ত্র এ দুটি?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার শ্রাবণ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু আছে যা তোমাদের চমকে দেবেই।

রবার্টের নিয়তি

ইংল্যান্ডের চেশায়ার কাউন্টিতে ১৪৬৭ সাল নাগাদ এক চাষার ঘরে জন্মেছিল রবার্ট নিম্নন। জন্ম থেকেই সে ছিল একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। তা সত্ত্বেও কিন্তু নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত সে। যেমন একদিন মাঠে কাজ করার সময় সে উত্তেজিত হয়ে চৌচিয়ে উঠল, আরে ডিক, আরে হ্যারি! সর্বনাশ হয়ে গেল ডিকের...আরে হ্যারিরই তো দিন আজ। মাঠের লোকেরা সেই মুহূর্তে তার প্রলাপ বুঝতে না পারলেও পরে জানতে পারল রবার্ট যখন চৌচামেচি করছিল ঠিক সেই সময় রাজা তৃতীয় রিচার্ডকে বসওয়ার্থের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন হেনরি টিউডার। যুদ্ধক্ষেত্রেই রিচার্ড মারা গেলেন এবং ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল করলেন হেনরি।

নতুন রাজা অচিরেই রবার্টের ক্ষমতার কথা জানতে পারলেন



আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠালেন। রাজার লোক প্রাসাদ ছাড়ার আগেই রবার্ট সে কথা টের পেয়ে যায়। সে তখন পাগলের মতো ছোট্টাছুটি করতে থাকে আর বলতে থাকে, রাজা তাকে ডাকছে এবার তাকে না খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না, তাকে ধরে নিয়ে আসা হলো রাজার কাছে। ইতিমধ্যে হেনরিও ঠিক করে ফেলেছেন রবার্টের ক্ষমতা কি উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। তাই রবার্ট এলে তাকে বললেন, তাঁর একটা হীরে হারিয়ে গেছে সেটা রবার্টকেই খুঁজে দিতে হবে। রবার্ট উত্তর দিল, যে লুকোতে পারে সে খুঁজেও নিতে পারে। সত্যিই হেনরি হীরেটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। এরপর রবার্ট ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ, কয়েকজন রাজার মৃত্যু ও সিংহাসন হারানোর খবর আর ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বাধার কথা আগাম বলে দিল। রাজা রবার্টের প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর তার অনশনে মৃত্যু হবে—এই ভয় ভাঙতে হুকুম দিলেন রবার্ট যখন যত খাবার খেতে চাইবে তখনই তাকে যেন সেই পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়। রাজার এই হুকুম শুনে রসুইখানার লোকজন রবার্টের ওপর বেজায় চটল। কিছুদিন পর রাজাকে লন্ডন ছেড়ে বাইরে যেতে হলো। যাবার আগে এক কর্মচারীর ওপর তিনি রবার্টের সব ভার দিয়ে গেলেন। হিংসুটে লোকদের হাত থেকে বাঁচাতে কর্মচারীটি রবার্টকে রাজার নিজস্ব একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল। কিন্তু জরুরি কাজে তাকেও শহর ছাড়তে হলো। যাবার সময় কিন্তু সে বন্দী রবার্টের কথা একদম ভুলে



গেল। যখন ফিরে এল রবার্ট তখন মৃত। বন্দী অবস্থায় না খেতে পেয়ে সে মারা গেছে।

সৈনিকদের দুর্ভাগ্য

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় একদল ইয়ংকি সৈনিককে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উত্তর ক্যারোলিনার স্যালিসবারিতে অবস্থিত কনফেডারেট বন্দী শিবিরে। ট্রেনে অন্য পাহারাদারদের সঙ্গে ছিল সতেরো বছরের বেভারলি টাকার। যে বন্দী দলটির ওপর সে নজরদারি করছিল তারা সারাটা পথ চাপা স্বরে এক বিদেশী ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। আসলে তারা পালাবার যড়যন্ত্র ভাঁজছিল। পাছে বেভারলি বুঝতে পারে, তাই সুইজারল্যান্ডের যে এলাকায় তারা আগে থাকত, সেখানকার ভাষায় কথা বলছিল। পথে একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে যেই তারা পালাবার চেষ্টা করে অমনি বেয়নেট হাতে তাদের ঘিরে ধরে পুরো পাহারাদার দলটা। বন্দীদের দুর্ভাগ্য যে তাদের পাহারায় ছিল বেভারলি। পুরো কনফেডারেট বাহিনীতে একমাত্র সেই-ই এই বন্দীদের ভাষা বুঝত। কারণ বেভারলি সুইজারল্যান্ডের এই এলাকারই একটা স্কুলে পড়াশোনা করেছিল।



দিনের প্রতিকৃতি

অস্ট্রফোর্ডের ফ্রাইস্ট চার্চ ক্যাথিড্রালে ১৯২৩ সালে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ক্যাথিড্রালের প্রাস্টার করা দেওয়ালে ফুটে ওঠে ওখানকারই এক নামকরা পাদরি ডিন হেনরি লিডেলের প্রতিকৃতি। পাদরি মারা গিয়েছিলেন ১৮৯৮ সালে। প্রতিকৃতি ফুটে ওঠার তিন বছর বাদে লন্ডনের এক সাপ্তাহিক পত্রিকা লেখে প্রতিকৃতিটা দেখলে মনে হয় যেন কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। অথচ আশ্চর্য ওটা স্কেচ করাও হয়নি বা দেওয়াল খোদাই করে বানানোও হয়নি। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ওটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। কিন্তু পরের বছর দেওয়ালটা জুড়ে একটা নতুন বেদী তৈরি হয়। ফলে প্রতিকৃতিটা চাপা পড়ে যায়।



নতুন ধাঁধা

১। রূপে বর্ণে একই দুজন ছিলাম পাশাপাশি
পৃথক করে দিলেন মোদের মা হঠাৎ আসি,
সেদিন থেকেই পাঠ্য বইয়ের বিষয় হয়ে তাই
দুই চরণের মিলন ঘটাই আমরা পাঁচটি ভাই।

সুবলচন্দ্র মজুমদার
শ্রুতিপাড়া, হুগলী

২। মাথা কাটো, লেজ কাটো
মিলে যাবে বিবি
মাথা জোড়, লেজ জোড়
পেয়ে যাবে কবি।

মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার
ধাঁধার উত্তরঃ

- ১। দস্তানা
- ২। করকচ
- ৩। পিক
- ৪। ভারত

৩। আকাশ আঁধার
সবটা সাবাড়।

৬ঃ উত্তমকুমার বটব্যাল
পাটমোহনা কোলিয়ারী, বর্ধমান

৪। একটি ছেলে খেলনার দোকান থেকে একটা গাড়ি ৬৮ টাকা দিয়ে কিনল। দোকানদার ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি বলে গেল নাম তার ওই গাড়ির দামের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ছেলেটির নাম কি?

মিহিরকুমার সাহা
বিজয়গড়, কলকাতা-৩২

নতুন শব্দমালা

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

১। মস্তিষ্ক ৩। সৈন্য ৫। গলার অলংকার ৬। বিনাশ ৭।
পুণ্যের বিপরীত ৯। বাঁটুলের বাড়ি ১২। বাণীরবৃক্ষ ১৩।
টিয়াপাখি ১৪। তরফে ১৫। হ-জ-ব-র-ল-র হিসাবরক্ষক
১৬। তারকামণ্ডল ১৮। পুজোয় লাগে ১৯। শূকর ২০।
মানুষরূপে দৈত্য

উপর-নিচঃ

১। শিব ২। অহংকার ৩। সন্তান ৪। বাঙালীর গ্রাম্য খেলা
৬। রক্তবর্ণ ৮। পরের নিন্দাকারী ১০। পুরাতন ১১। অদ্ভাণ
মাসের শুক্লা একাদশীতে যে যুদ্ধের শুরু ১৩। হাতের
মধ্যে ভোরের তারা ১৪। পাখি ১৫। সেকাঁ মাংস ১৭।
চোখ

এটি তৈরি করেছেন অমল মজুমদার, মদনমোহন পাড়া,
দিনহাটা, কোচবিহার।

২	২			৩		৪	
৫			৬			৭	৮
৯		১০			১১		
		১২					
	১৩			১৪			
১৫			১৬			১৭	
১৮							
১৯			২০				

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর:

পাশাপাশি: ১। কুবের ৩। হাপর ৫। সরতা ৬। ক্ষীর
৮। তলব ৯। নশ্র ১০। তীর্থ ১১। ইভ ১২। জটা
১৩। দাই ১৫। অত্রি ১৭। দ্রবেদে (দেবেদে) ১৯। মশা

২১। যামিনী ২২। দিদিমা ২৩। লবণ

উপর-নিচ: ১। কুচ্ছিত ২। রসবতী ৩। হাতান ৪। রক্ষী
৭। রক্তাভ ১২। জঙ্গম ১৪। ইন্দ্রনীল ১৬। ত্রিয়ামা ১৮। দেয়ান
২০। শাদি

ছবির খেলা

এদের দেখে বলো তো কে কি খেলায় মেতেছে?



১। ছবি ২। ছবি ৩। ছবি ৪। ছবি ৫। ছবি ৬। ছবি

চৈত্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম:—

১। কলকাতা ১১

মিশ্র, মিডিল, মুন্সাল, তোটি, রুক, ঘীরা ও কমলকৃষ্ণ সরকার/নিমতলা লেন, কলি-৬; পূবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন, কলি-১১; অদিতি, বন্দনা দাস ও ইলা নাগ/মিডিল রোড, কলি-১৪; অনিন্দা চন্দ্রবতী ও অমিয়কুমার দত্ত/সুবেন সরকার রোড, কলি-১০; বাবা, মা, ঠাম্মা ও শতুপর্ণা কর্মকার/সিমলা রোড, কলি-৬; করবী, শিখা, অশিস, শিখালী ও সুবজিৎ বসাক/অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, কলি-১০; অরুণিমা ও শীলা মণ্ডল, কৌত্তভ, উৎপল ও কৃষ্ণা ঘোষ/শুভা বার্ড লেন, কলি-১০; সত্ৰাজী, রাজেন্দ্রী ও ঐশ্বর্য রায়/মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলি-৬; মিতা, শবনম, শিবান্ময়ন, তাতাই ও তুলি/দমদম রোড, কলি-৩০; সীমা, জয়ন্ত, টিঙ্কু ও সমিত মণ্ডল/সল্টলেক, কলি-১১; শ্যামল, ইলা ও সুজয়/বঙ্গলী পল্লী, স্বমিজি রোড, কলি-৬০; দেব, মিত্রা, অমৃত ও অনন্যা চৌধুরী/পশ্চিম কমলাপুর, কলি-২৮; শতাজী ও শবরী ঘোষ/নবপল্লী, বাগুইয়াট, কলি-৫১; মা, বাবা, অতনু ও অনুজকুমার চন্দ্রবতী/লবনি, সল্টলেক, কলি-৬৪; যামন, বিপ্লু, মৃণাল ও কুশাল চন্দ্রবতী/এল-২, কোল ইন্ডিয়া কমপ্লেক্স, বাঘা যতীন, কলি-৮৬; সৌরভ, শান্তনু, চৈতালী, বিশ্বনাথ, গায়ত্রী, ছবি ও পনি/শ্যামান কালীতলা রোড, কলি-৮; মা, কাজল, বিউটি, কল্যাণ, সোমা, পাপুন ও বাবুন সাহু/গোয়াবাগান, কলি-৬; রুমা, সীমা, বাবা ও মা/দমদম পার্ক, কলি-৫৫; মালবিকা, ছায়ারানি ও গৌরদাস সাহা/পল্লী পল্লী, কলি-৬০; তোতন,

আম্মা, সঞ্জল, শিল্পী, সামন্তী ও দীপন্তী মজুমদার/এন. জি. বসাক রোড, কলি-৮০; পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়, কলি-৩২; ইন্দু, তোলু, মাধব, শাহুনাছ ও শামশাদ/এন. এন. রোড, কলি-১১; জয়দীপ, কাকন, পরিক্রান্ত, রণদীপ ও দীপিকা চন্দ্রবতী/বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭;

১২৪ পরগনা ১১

অনিমেধ, সুজয়, কৌশিক ও প্রতিমা দাস/আতপুর পশ্চিম কাপ্তেনপাড়া রোড, উঃ ২৪ পরগনা; অবিদ্য বসু রায়চৌধুরী/এস. এন. মজুমদার রোড, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা; কর্ণা, চম্পা, প্যারিস, স্বপন, হেনা, রাহুল, মনা, পরশ, যামণি, রেক্সোনা, ফাইন, রাজীব, নিতা, শিভা, পলাশ, বিলাস, বুলটি ও শোখন/সিঁথি পাড়া, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা; বৈশালী সাহা, বৌমণি, দাদাতাই, বাবা ও মা/পশ্চিমপাড়া রোড, বহড়া, উঃ ২৪ পরগনা; তান্তর ও বরুণ কুমার দাশগুপ্ত/সিংহবাগান, ঘণিরামপুর, উঃ ২৪ পরগনা; শিখালী ও বর্ণালী কর/বটানগর কাছারিবাগান, দঃ ২৪ পরগনা; শংকর, কংকর, শিপ্রা, গোপা ও মিঠু দে, মৌসিত্তা ও মোনালিসা মণ্ডল/চাঁপাডালিমেড, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা; সমীর ও অনাবিল ঘোষ/লালপুর ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা; প্রদয়শঙ্কর ঘোষ/সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা; টুঙ্গা, পুষ্পা, ফুর্নাই, লুটি ও মার্টু বৈদ্য/কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগনা; দীপা, মীপা, পলাশ ও শিখর নন্দর/কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগনা; পাপু, আগু, চম্পা, শম্পা, বিটু, মিতুল, রাজু, শিৎকি, দেবী, অরুণ, রক্তা, অশর্ণা, মা, শুনু ও কুনু/বামনগাছি, উঃ ২৪ পরগনা;

॥ হাওড়া ॥

সৌম, সৌরত, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজী/অনন্তদেব ঘুঝাজী লেন, শিবপুর; প্রদীপ, অপরূপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মহুসুদন বিশ্বাস লেন; প্রভাত, গীতা, কৌশিক ও শান্তা/সাতঘড়া লেন; শুভদীপ, শুভা ও দিলীপ হালদার/হালদার পাড়া লেন, শিবপুর; সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়/বি.গার্ডেন, শিবপুর; পুলক মজুমদার ও অমলিন ঘোষ/আমতলা গলি; বাবুন, মুচি, বোনা ও পাগাই/দানু বোস লেন; সুদীপ ও কাকসী/বি. গার্ডেন, শিবপুর; অরবিন্দ, বিমলেন্দু, আব্দুরবাল, গীতারানি ও সাত্ত্বনা ঘোষ/সদরবস্তী লেন; চন্দ্রশেখর ও নতুন মাল্লা/বাজে শিবপুর রোড, শিবপুর; অতনু মণ্ডল/উলুবেড়িয়া; আদিত্য, মালতী ও আশিস কানোর/গণেশ চাটাজী লেন; হীরালাল, রুমা ও পাশাই/বলুহাটি; রূপক মাজী/বি.ই. কলেজ; জয়, মা, বাবা ও দাদু/নটর পাল রোড, রথতলা; বিয়া, বাপন, বাব্বা ও বেবু ঝাঁ/ইছাপুর রোড; সৌরভ, সত্রাট ও প্রণব মণ্ডল/তেঁতুলকুড়ী; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী ঘুঝাজী/গণেশ চাটাজী লেন, শিবপুর; রীমা, লীনা, পিয়ালী, সোনালী, শুভদীপ, ইন্দু ও পুলক/শঙ্করনতলা; প্রভাত, তপতী ও ঐক্যীলা গঙ্গোপাধ্যায়/মৃত্যুঞ্জয় দে লেন; সৌমহত ও প্রীতম দেব গুপ্ত/শেখপাড়া লেন; প্রিয়ব্রত ও প্রীতম মণ্ডল/ইছাপুর দঃ পাড়া, সাত্ৰাগাছি; অর্পণ, কৃষ্ণা ও বিমান মণ্ডল/অক্ষয় চক্রবর্তী লেন; রমেশচন্দ্র দত্ত ও নির্মলেন্দু ঘোষ/বারুইপাড়া, ডোমজুড়; অমিতাভ, অরুণাভ, আনামিকা ও অরিশম/বদর বস্তী লেন; পরিবেশ ও সুনিবেশ নন্দর/জোয়ারগোড়ী, বাগনান; সৌম, পিংকি, মিঠু ও সুশীল দাশ/জয়নারায়ণ বাবু আনন্দ দত্ত লেন, উত্তর বুক্ট; ॥ হগলী ॥

স্বপ্না ব্যানাজী/কালনা রোড, ত্রিবেণী; বাবা, মা, দাদা, দিদি, ভাই, বোন, পিসি, মশাই, কাকারা, কাকীমারা, গ্যাবলো ও আমি/চাতরা, শ্রীরামপুর; মুনাই, মোম, মণি, দেবপ্রী, শমি, পুশাই ও সায়ন/রেল গেট, বৈদ্যনাথি; দেবযানী, সুমিতা, রিমি, রিমি ও টুয়া বোস/আর. কে. এম. লেন, চাপাদানী; প্রীতম, মৌমিতা, তৃপ্ত, ভূটো ও মনা সাহা/বিবেক পল্লী, শেওড়াফুলি; অশোক, ইশান, সুরঞ্জনা ও সুনিতি ঘুঝাজী/মাহেশ; অরুণা, বরুণা, তরুণ ও মাল্লা/হরিরামপুর; টাট্টু, রাজু ও বাবা/নর্থক জুট বিলস, বৈদ্যনাথি; দেবশিস ও রেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/এল. এম. ভট্টাচার্য স্ট্রিট, শ্রীরামপুর; অমিয়দা, সজল, শীলা, মিতালী, গণেশ, গিরিদা, রানা ও পাণ্ডো/চাতরা, শ্রীরামপুর; স্বতী ব্যানাজী/জমিদার রোড, শেওড়াফুলি; শাহত ও মুক্ত বসু/নেতাজী লেন, বৈদ্যনাথি; ॥ বর্ষমান ॥

জগৎ, বাণি, চন্দন ও লব বাফকর/আসানসোল; অঞ্জন, অদিত্য, সুনন্দা ও রবি রায়চৌধুরি/ভাতাড়, কুমতলা; জয়তি নায়ক/মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়, আসানসোল; জহর, দীপ্তি, মিলি ও মায় নায়ক/হিল ভিউ, আসানসোল; টুপ্পা, অসিত ও কুনা/রাধানন্দ, আসানসোল; পলাশ, পারিজাত, লোটন, ছোটন ও নয়ন ঘাঁট/ঘাঁটগলি, আসানসোল; প্রসন্ন, পার্থ, মানস, সুদীপ, শিব, সনত, নীলাদ্র, কোয়া, যদু ও সাগরিকা/এ. বি. টাইপ, রঙ্গপাড়া, বার্পপুর; পরেশ, চন্দনা, রাধী, রত্ন, বজ্রমায়া, রাজু ও মমুখিতা দাস/শিয়ালডাঙা, কুলটী; সুদেবা ঘুঝাজী ও সুমা দাঁ/মহিশীলা কলোনি, আসানসোল; তিমিরজ্যোতি, মল্লিকা, দেবজ্যোতি, মঞ্জরী, তারানাথরী, অনন্যা ও গৌতম/কৈলুড়; মায়্যা ও রুমা মণ্ডল/রাণিগঞ্জ, ঝাঁড়তলি বাজার; পাপু, রিমি ও শিল্পী মিত্র/ছোট নীলপুর, সদর; মা, বাবা, মেজকাবু, অজিত, শুভেন্দু ও বিকাশ ঘাঁট/আসানসোল; সুমেধা, দেবপ্রতি, ঞ্জুপর্ণা ও সুশেতা/বার্পপুর; শতভিষা, যশোধারা, বাসবী ও ডাঃ উত্তমকুমার বট্টোপাধ্যায়/গাটমাহানা কোলিয়ায়ী; মনু, শর্মিলা, শাঁওলী, দেবপ্রী, অর্জি, সৌরীন, রঞ্জিতা ও রিঙ্কু ভট্টাচার্য/জয়দেব এডিনিউ, দুর্গাপুর; ডালিয়া, যিনি, বৃষ্টি, পারমিতা ও জয় ঘাঁট/এর সি. ব্যানাজী লেন, আসানসোল; সিবু, অমিত, বিশ্বনাথ, বোলু, সুবল ও তিমিরবরণ চন্দ্র/গুসকরা; অমির, প্রদীপ, সাধনা, প্রণব, অনিন্দিতা, অপিতা ও প্রসেনজিৎ দত্ত/গড় দরঙ্গা, বিষ্ণুপুর; বাণী, বন্দনা, শম্পা, টুপ্পা ও কুবু/উত্তর প্রতাপ বাগান; তনুশ্রী মণ্ডল/জয়পুর; শান্তনু, সন্দীপ, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জন ও রাজু/লোকপুর; সৈকত, পুটি, সূটি, মণি, সোনা, গোপল ও বিট্টু/নতুন গিট; মিল্টন, কল্লোল, মৌসুমী, পার্থ, অষ্টমী, বৈশাখী ও টুপি ঝাঁ/মনোহর; নির্মল ও অজিত/নতুনগ্রাম; মনন রায়, ডাঃ রামপ্রসাদ ঠাক ও দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/চাতরার মোড়, দলদিঘি; সিদ্ধার্থ, যাক্তনী, অর্পণ, শ্রিতা ও অনিতা মুখোপাধ্যায়/অর্থগ্রাম; বিকাশ, ইন্দ্রনীল ও মীনা রায়, শম্পা ভকত, ভোবল ও ছোটন বায়েন/মেজিয়া, ঝুলপাড়া; ডলি, বকুল ও দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/দিগপাড়া; জয়দীপ ও জয়শ্রী রায়/উষাড়িডিহ; শ্যামল, তনুশ্রী, বাবাই ও টুকাই বিশ্বাস/সোনামুখী; ওপতী, তাপসী ও বাবা/বিষ্ণুপুর রেলওয়ে কলোনি; টুপ্পা, গৌতম, যুগু ও মৈত্রেয়ী ঘুঝাজী/জি.পি.সিহ রোড; মা, বাবা, পাগাই ও রাধী/হরিতকীবাগান, কৈলুড়িয়াডিহ;

॥ মেদিনীপুর ॥

দেবমালা ও দেবযানী ঘুটিয়া/দেশচক; বাবা, মা, ঠাকুমা, অরুণ, দেবপ্রী, মানসী, বনপ্রী, তপপ্রী ও তনুশ্রী ভট্টাচার্য/বেলপাহাড়ি; সমীর, সায়ু, শম্পা, তিমির, অরুণ, মলয়, স্বরূপ, স্বপন, গৌতম ও মধু দে/কাঁকো নিবেদিতা টেলার্স; বাবা, মা, সৌমিক ও শৌভিক চৌধুরি/গড়বেতা; বলরাম, শুভা ও শুভায়ু ঘোষ, প্রবোধকুমার মিত্র/মেদিনীপুর; সজোষ, অরুণা, সুদীপ ও বিশ্বদীপ দাস/ভমলুক; সায়ন্তনী, জয়, দেবপ্রিয়া ও প্রসেনজিৎ চৌধুরি/চন্দ্রকোণা রোড; সোনা, সোনালী ও সোনামণি মাইতি/কালিকাবালি, মঠচন্দীপুর; বাপন, মোহন ও শোভন মাল্লা/নরসিংহপুর, আশাদতলা; ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ/দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যালয়, শুক্লকল্পপুর; দেবপ্রসাদ, বিজলী, শুভাশিস ও লক্ষী কোলে/নিমপুরা, ঞ্জুগপুর; সুরজিৎ, সুপর্ণা ও শুভায়ু কোলে/নিমপুরা; সৌরভ, শৌলমী, পাপু, পণি, শ্রীধর ও শিবানী সামন্ত/কাখুরিয়াবাড়ি; সোমা, সাধী, সুনন্দা ও দেবযানী রায়/গড়বেতা;

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

মৃণ্ময়কান্তি ঘোষ, অর্পণ দাস, ভারতী সরকার, বাবা, মা, দাদু ও বিরতি সরকার/মানকুমারী রোড, বহরমপুর; শান্তনু, সৌগত, সুমাংসু, সঞ্জিতা ও সোহম চন্দ্র/নেহলিয়া, জিয়াগঞ্জ; মনিরা ও মধুরিমা মিত্র/মধুপুর রোড, বহরমপুর; দেবারতি ঘুঝাজী/শিলখানা রোড, বহরমপুর; শঙ্কু, অণু, শুভ, দীপ ও উত্তম/গুলিয়ান; বিশ্বজিৎ ঘুঝাজী/সুখেন্দু নিবাস, বনবিহারীপাড়া, জলীপুর; ॥ পুরুলিয়া ॥

মোহন, সুবল, অপরাধা ও শান্তি/রঘুনাথপুর; করুনা, বিকাশ, চিত্ত, পলাশ ও মৌসুমী/লাগনা; হেমন্ত ও উজ্জ্বল দত্ত/আহ্লা; দীপককুমার চৌবে/আনাড়গ্রাম;

॥ বীরভূম ॥

সোহমকুমার চৌধুরি/ডেপুটি জাইরেস্টার সেরিকালচার অফিস, সিউড়ি; বিপিন বিশ্বাস, অনুপ রায়, শুভম, বেবী ও তপেন্দু পট্টনায়ক/অরবিন্দ পল্লী, সিউড়ি;

॥ নদিয়া ॥

দেবু, রিটু, দীপ ও ঞ্জু/গোলাপটি, কৃষ্ণনগর;

॥ জলপাইগুড়ি ॥

সমর ও সাধন দে/শিববাড়ি, কামাখ্যাগুড়ি;

॥ বিহার ॥

অক্ষয়, অনন্ত, নিরন, সুধীর, স্বপন, গয়া, রাজকিশোর, মিঠু, টুপু ও হার্টার/পূর্ব সিংড়; গৌরীনাথ, কান্তিকুমারী, রুনা, সোনা ও সোমা ঘোষাল/চস মেন রোড, বোকারো; রঞ্জন, কাকন, চুনীলাল, স্বপন ও বড়ল/গাকটি, জামশেদপুর; চপল ও সোমা ভট্টাচার্য/পাঞ্চে ডায়, বানবাং; মলয় ও তপতী/প্রেমনগর, সিংড়; গৌরীমণি, তনুমণি, গিরিরাজ, ঞ্জুতরাজ, বাবা ও মা/মোহনীগোল, পূর্ব সিংড়; নিরঞ্জন ও রুবন গুপ্ত/জামশেদপুর; মলয়, বিমল, লক্ষ্মীনারায়ণ, আশিস, দয়ানিধি ও ইন্দ্রজিৎ/মহলীগোল উচ্চ বিদ্যালয়, পূর্ব সিংড়; স্বপন/কোকশাড়া; মা, বাবা, দাদু, কৌশিক ও সৌমিক আল/চিকিতা; সন্দীপ, সায়ু, সজল, মলয়, বাবলু ও ডাক্তার ধীমান/যোগী কমপ্লেক্স, পরশুভিৎ বাজার, জামশেদপুর; সন্দীপ, সীমা, শঙ্কু, গৌরব ও শিটু/পারিজাত রোড, প্রথমনগর, জামশেদপুর; পুলক ও শিউ সূত্রধর/প্রথমনগর, জামশেদপুর; অনন্ত, সুবাই ও রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা, রায় সাইমুদ/নলদহা, কোকশাড়া, পূর্ব সিংড়; চুম্বী, মুন্সী, বনা, টুটনা, রানা ও রাজা দাস/মোহনীগোল, জটশিলা; সুতী, শিল্পী, সুপর্ণা, স্বরূপ ও স্বপন/টিসকো কমপ্লেক্স কলোনি, জামশেদপুর;

॥ আসাম ॥

শিউ, চয়ন, রত্না, টুপাই, শিঙ্কু, ব্রুমা, স্বপ্না, বৃক ও দেবপ্রপা দত্তরায়/ডরল নগর, গুয়াহাটি; সমর বিশ্বাস, প্রসন্ন, পাণ্ডিয়া, প্রশ্নব ও সুজতা চন্দ্রভট্ট/আশ্রম রোড, হাইলাকান্দি; সুমিত, রটু, কাকু, কাকিমা, মা ও আমি/লিডু কলোনি; ॥ ওড়িশা ॥

মনোজিৎ, সুধা ও গোপা ভট্টাচার্য/ইউনিট-চার, ভুবনেশ্বর;

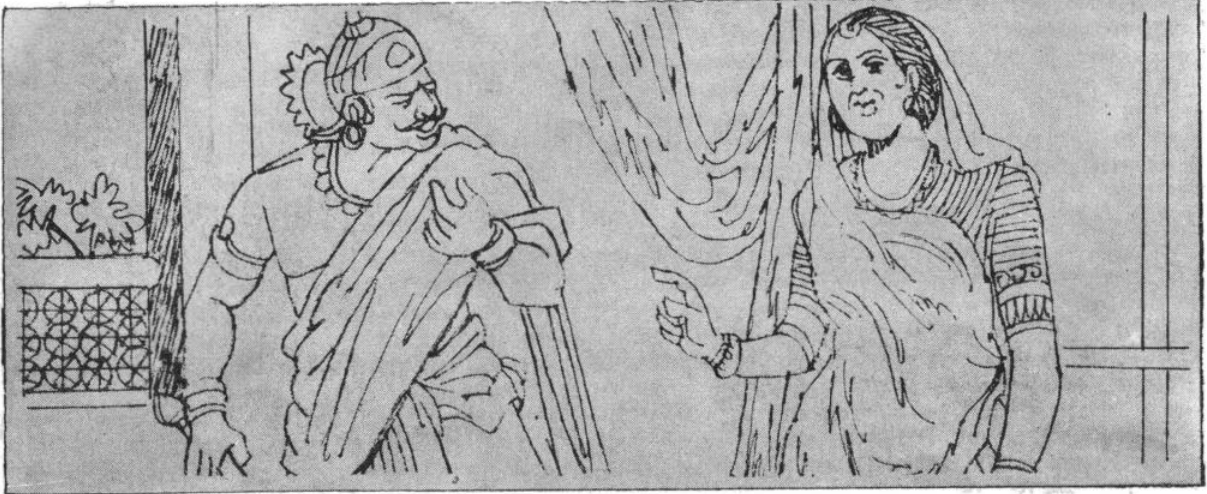
॥ ত্রিপুরা ॥

তুলি ও অজীদেব নাথ/পোস্ট অফিস রোড, বর্ধমানগর;



মাঘের শীত

বিপ্লব পাল



কুন্তীপুত্র ভীমের কথা সকলেরই জানা। তেজস্বী, বলবান ভীমের দেহে ছিল অস্বাভাবিক শক্তি। যাকে বলে সহস্র হস্তীর বল। তার গর্জনে থরথর করে কেঁপে ওঠে পৃথিবী। তাই নিয়ে ভীমের গর্বের শেষ নেই। অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না। কাউকে বেয়াত করে না। গুরুজনদের গণিমানী পর্যন্ত করে না। ছেলের এমন মতিগতি দেখে মা কুন্তী মনে মনে বিশেষ চিন্তিত হন। কিন্তু কাকে কি বলবেন? ভীম কোনো কথা শোনারই পাত্র নয়। এ কথা তিনিও জানেন, ভীমের মতন এমন বলশালী কে-ই বা আছে? কিন্তু কথায় বলে অহংকার পতনের মূল। অহংকারে মত্ত ছেলের ক্ষতি তিনি মা হয়ে সহ্য করবেন কি করে? তাই ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্য একদিন মনে মনে তিনি একটা ফন্দি আটলেন।

সেদিনও ভীম যথারীতি শারীরিক কসরতে মত্ত ছিল। গদা ঘুরিয়ে মুহূর্ৎ হংকার ছাড়ছিল। তার হংকারে শাস্ত বনের পশুপাখিরা সব বন ছেড়ে পালিয়ে গেল। ঠিক এমন সময় মা কুন্তী এসে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন।

একগুঁয়ে ভীম কিন্তু খুব মাতৃভক্ত ছিল। মা এসে দাঁড়াতেই সে কসরৎ বন্ধ করে বিনীত ভাবে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, কি আজ্ঞা, বল মা?

মুদু হেসে কুন্তী বললেন, পুত্র, তুমি তো জগতে নিজেকে

সবচেয়ে বলীয়ান বলে মনে কর, তাই না? কিন্তু তোমার চেয়েও একজন বলবান বীর আছে, যে নিজেকে জাহির করে না—চুপচাপ থাকে।

মা মিথ্যা বলবেন না। স্বভাবতই মায়ের কথায় আত্মগবী ভীমের পৌরুষে ঘা লাগল। বিস্মিত কণ্ঠে কুন্তীকে সে জিজ্ঞাসা করল, সে কি মা? কে এমন বীর আছে যে আমি তাকে জানি না। এফুণি বল মা সে কোথায় থাকে? একবার পরীক্ষা করে আসি।

কুন্তী ভীমকে বললেন, আছে পুত্র। ঠিক উত্তরে হিমালয়ের দিকে কাল উষালগ্নে যদি এগিয়ে যাও, অবশ্যই দেখতে পাবে। মল্লযুদ্ধ করতে চাইলে তুমি তোমার প্রিয় গদা সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। তবে একটা কথা, তোমাকে খালি গায়ে যেতে হবে।

ভীমের আর তর সয় না। মায়ের নির্দেশমত পরদিন প্রত্যুষেই গায়ে ভালোমতো তেল মেখে গদা নিয়ে রওনা হলো। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হংকার ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চললো। গদার ঘায়ে গাছপালা ভেঙে পড়লো। বাঘ, ভালুকেরা প্রাণের ভয়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগলো। মনে হচ্ছে সেই অজানা বীরকে সামনে পেলে এক ঘায়ে চুরমার করে দেবে তাকে। এভাবে মাইলের পর মাইল হেঁটে চললো ভীম সেই বীরের অন্বেষণে। কিন্তু কেউই তার সামনে এলো না।

এদিকে যতই এগোয়, ততই কাহিল হতে থাকে কুন্তীপুত্র। তখন মাঘ মাস। মাঘের হাড়-কাঁপানো শীতে কাঁপুনি ধরে যায়। দেহে মেখে আসা তেল যেন জল হয়ে যায়। একসময় দেহ এমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে যে পথ চলাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শেষে প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল হয়ে উঠবে, এই ভেবে ঠক্কণ করে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে ভীম। মাথায় ওঠে সেই অজ্ঞাত বীরের খোঁজ করা।

কাহিল ভীমকে ফিরে আসতে দেখে কুন্তী অলক্ষ্যে হাসেন।

জিজ্ঞাসা করেন, পুত্র, ফিরে এলে? তোমার চেয়েও বলবান সেই বীরের দেখা পেয়েছো? এ কি! তোমার এমন অবস্থা কেন? কি হয়েছে, কাঁপছো কেন এমন করে?

ভীম তখন কথা বলতে পারছে না। কোনোরকমে বলল, মা! এই প্রবল শীতে.....

ছেলেকে কথা শেষ করতে দিলেন না কুন্তী। তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, তাহলে তোমার চেয়েও শক্তিশালী কেউ আছে বলো? এমন পরাক্রান্ত বীর হয়েছে শীতকে জয় করতে পারলে না পুত্র?

মায়ের ইঙ্গিত বুঝতে পারলো ভীম। মায়ের পা ছুঁয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি মা। প্রতিজ্ঞা করছি নিজের শক্তি নিয়ে আর কোনোদিন অহংকার করবো না।

নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

জীবন্ত সরস্বতী পূজো

অশোককুমার প্রধান



শীতে চড়ুইভাতি করতে যাওয়া, সার্কাস দেখা, বইমেলায় ঘোরা, ক্রিকেট খেলা এসব নিয়েই সাধারণত সবাই আনন্দে মেতে থাকে। কিন্তু দামোদরের তীরে আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণপুর গরীব গ্রাম। সকলেরই নুন আনতে পাস্তা ফুরোয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো
ছোট বড় সকলের জন্য বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার

এনসাইক্লোপিডিয়া

☐ সমুদ্রের জল নোনা
কেন ☐ গুটি ফোলে
কেন ☐ হাউই কেন
আকাশে ওঠে ☐ টিডির
কাচ বাঁকা থাকে কেন ☐ পিঁপড়ে
কেন সার বর্ধে চলে ☐ পরীক্ষার আগের
রাতে পড়তে হয় কেন ☐ টুনটুনি পাখি কেন
করে চেনা যায় ☐ খাওয়ার পরে ঘুম পায়
কেন ☐ তালগাছ কেন লম্বা হয় ☐

শুধু এই নয়, এইরকম
কৌতূহল জাগিয়ে তোলা
আরও হাজারো প্রশ্নের
বিজ্ঞানসম্মত উত্তর
দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের
১৫টি স্বতন্ত্র শাখায়।
উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট
বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ।

পি.টি.এস. অফসেটে
ছাপা বড় মাপের প্রায়
৪০০ পৃষ্ঠার বই

রঙিন অফসেট প্রচ্ছদ

বিষয়সূচী

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান,
ইলেকট্রনিক্স, বিদ্যুৎ, আবহবিজ্ঞান, ডু-বিজ্ঞান,
সমুদ্র ডু-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান,
বিচিত্র পক্ষিজগৎ, বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ ও বিচিত্র প্রশ্নমালা।

অরুপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান যখন ভাবায়

লিখেছেন

অজয় হোম, অনীশ দেব, অমিত চক্রবর্তী, অরুপরতন
ভট্টাচার্য, তরুণকুমার দাশ, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
পার্থ সারথি চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ
সান্যাল, মৈত্রেশী মুখোপাধ্যায়, রমাতোষ সরকার,
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, হরমোহন মুখোপাধ্যায়

☐ দাম : ১০০ টাকা মাত্র ☐

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

তাই ওসব আর হয় না। তবে প্রতি বছর চাঁদা তুলে মাঘের শীতে দুলে মাস্টারের বাড়ির সামনে সরস্বতী পূজা করা হয়। তাতে গ্রামের সবাই আনন্দ করে। খুব হৈচৈ হয়।

গত বছরও চাঁদা তুলে আমি, দীপু, অষ্টা, গোবিন্দ, তজা, বিশুদাদু, মাস্টারকাকা আমরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সরস্বতী পূজার আনন্দ! শত দুঃখেও সাজ-সাজ রব। পরের দিন পূজা। মাঘের কনকনে শীতে রাত জেগে মণ্ডপ তৈরি করছি, ফুল তুলছি। তখন রাত এগারোটো হবে। আবার ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে।

এমন সময় খালের ধার থেকে কান্নার রোল উঠল। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। দেখি, আমাদেরই গোবিন্দের ছোট বোন সরস্বতীকে সাপে কামড়েছে। মাটিতে পড়ে হটফট করছে সে। মা-ঠাকুমাদের কথায় কালু ওঝাকে আনা হয়েছে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি। তখন দুলে মাস্টারের পরামর্শে মণ্ডপ গড়া, পূজার আয়োজন করা ছেড়ে চাঁদার টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি আমরা উলুবেড়িয়া শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম সরস্বতীকে।

আমাদের এই উদ্যোগের ফল ভালই হলো। গোবিন্দের বোন সরস্বতী বেঁচে সুস্থ হয়ে ফিরে এলো কয়েকদিন পর। সে বছর আমাদের আর মা সরস্বতীকে পূজা করা হয়ে ওঠেনি, তবু সবাই খুব আনন্দ করেছি আমাদের বোন সরস্বতী ফিরে আসায়।

দুলে মাস্টার বললেন, মাঘের শীতে মাটির সরস্বতীর বদলে তোরা জীবন্ত সরস্বতীর পূজা করলি।

ছবি: সুফি

এ ছাড়াও যাদের লেখা ভালো হয়েছে:

পাপিয়া ত্রিবেদী (দুর্গাপুর, বর্ধমান) ॥ চন্দ্রাণী বসু (কাঁচরাপাড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ॥ গৌরচন্দ্র সাহা (বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ॥ অঞ্জনা চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণনগর, অসম)

বিশেষ পুরস্কার

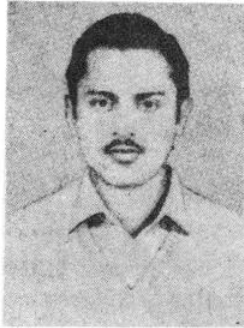
এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছে। আমাদের লেখক এবং বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবশিসের নামে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এই মাসের পুরস্কারপ্রাপকরা:

বিপ্লব পাল, অশোককুমার প্রধান, সৌরভ রায়, দীপককুমার চৌবে ও সুকান্ত দাশ।

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বঙ্গালয়ের সত্ত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতা নির্মল সাহা'র স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো নির্মল সাহা সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।



বিষয়বস্তু:

হাজার খুশি রথতলাতে

জন্ম—৩ জৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪৬, মৃত্যু—১৬ তাদ্র, শনিবার ১৩৮৫

প্রথম পুরস্কার: ১০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার: ৫০ টাকা

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ আশ্বিন।

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা হবে।

সৌজন্যে: আদি ঢাকেশ্বরী বঙ্গালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন

১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০০১৯

বি

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা এলেই সোনার পরীর কথা মনে পড়ে। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছিলো সোনার পরীর যুগ। আঠারো ক্যারেট সোনায়ে তৈরি। দৈর্ঘ্য মাত্র ছত্রিশ সেন্টিমিটার। ফিফার তখনকার সভাপতি মিশিয়ে জুলে রিমের নির্দেশে ট্রফিটির নকশা বানিয়েছিলেন ফরাসি শিল্পী সিলভিও গাজালিও। সেই নকশা দেখে সোনার মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন মণিকার বার্তোনি। মিশিয়ে জুলে রিমে নিজের খরচে তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে ট্রফিটির নাম দেওয়া হলো জুলে রিমে, যাকে সারা ফুটবল-বিশ্ব সোনার পরী বলেই জানতো। ঠিক হলো, যে দল প্রথম তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে তারাই চিরকালের মতো পেয়ে যাবে ফুটবলের সোনার পরীকে।

১৯৭০ সালে বলের রাজা পেলের হাত ধরে সোনার পরী চিরকালের মতো চলে গেলো ব্রাজিলে। তারপর থেকে চলছে ফিফা বিশ্বকাপের যুগ। সোনার পরী জুলে রিমে এখন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু বিশ্বকাপ এলেই সবার মনে পড়ে জুলে রিমের কথা।

পেলে চিরকালের মতো সোনার পরীকে নিয়ে যাবার আগে সোনার পরীর ওপর চোখ পড়েছিল তস্করদেরও। একবার নয়—দু দুবার। প্রথমবারের ঘটনা তো বড় ভয়ঙ্কর। এখন শুনতে গল্পের মতো মনে হলেও তখন কিন্তু ব্যাপারটা ছিল রক্ত হিম করা। সেই গল্পটাই আগে বলি।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আতঙ্ক আর আশঙ্কায় সারা পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। বারুদের গন্ধ আর ভারী বুটের শব্দে রক্ত জমাট-বাধা ভয় মনের মধ্যে চেপে বসেছে। গোটা দুনিয়াটাই প্রায় ফৌজি মানুষের কজায়। যুদ্ধের সময় আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকে না। তাই যার যা ইচ্ছে তাই করছে। মানুষের জীবনের দাম তখন কানাকড়িও নয়। তখন হিটলারের জার্মানির সঙ্গে মুসোলিনীর ইতালির গলায় গলায়



সোনার পরীর গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাব। ১৯৩৮ সালে ফুটবলে বিশ্ববিজয়ী হওয়ায় সোনার পরী তখন ইতালির জিম্মায়। যুদ্ধের বাজারে সোনার ঐ ট্রফিটির দাম নেহাত কম নয়। তাই সেনানায়কদের চোখ পড়লো জুলে রিমে ট্রফির ওপর। ওঁরা ঠিক করলেন, ট্রফিটা গলিয়ে ফেলে সোনা বিক্রি করে দেবেন। তাহলে অনেক টাকা এসে যাবে তাঁদের পকেটে।

১৯৭০-এর ইতালির বিরুদ্ধে গোল করে বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তে পেলে।





ইতালি বিশ্বকাপ ফাইনালে মারাদোনাকে বাধা দিচ্ছেন ম্যাথ্যুস।

হিটলারের নাৎসী সেনানায়কদের চোখ যে জুলে রিমে ট্রফির ওপর পড়েছে সেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেলো। খবর পেয়ে ইতালির ফুটবল কর্তাদের মাথায় হাত। তাঁরা ভেবে পান না সেনানায়কদের হাত থেকে কিভাবে ট্রফিটি বাঁচাবেন। তাই সবাই মিলে গোপনে আলোচনায় বসলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক সোনার পরীকে তাঁরা বাঁচাবেন। কিন্তু কি ভাবে? হিটলারের নাৎসী বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু জীবন পণ করে ইতালি ফুটবলের ক'জন কর্তা সদর দপ্তর থেকে ট্রফিটি বের করে এনে বিশেষ একটা জায়গায় সাত হাত মাটির তলায় সেটি ধুতে ফেললেন। তারপরই নাৎসী কর্তারা গিয়ে হাজির হলেন ইতালির ফুটবলের সদর দপ্তরে। ট্রফি হাতাতে এসে তাঁরা দেখলেন পরী উড়ে গেছে। তন্নতন করে খুঁজেও তাঁরা ট্রফিটি পেলেন না। অফিসের কেউ ট্রফিটির কোনো খবরই দিতে পারলো না। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বেরিয়ে এলেন নাৎসী কর্তারা।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ইতালির ফুটবলের কর্তারা সেই গোপন স্থানে গিয়ে সাত হাত মাটির তলা থেকে সোনার পরীকে উদ্ধার করে এনে তুলে দিলেন ফিফার কর্তাদের হাতে। জোর বেঁচে গেলো সোনার পরী।

দ্বিতীয়বার সোনার পরী তো প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। তবে সেই তস্করচূড়ামণি শেষ রক্ষা করতে পারেনি। এ সেই ১৯৬৬ সালের কথা। খোদ লন্ডন শহরেই ঘটেছিল ঘটনাটা। সেবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ইংলন্ডে হবে। তাই সকলের দেখার জন্যে সোনার পরীকে

সাজিয়ে রাখা হয়েছিল প্রদর্শনীশালায়। প্রদর্শনীশালার পাহারায় ছিলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বাহিনী।* ধুরন্ধর গোয়েন্দা বলে তাঁদের বিশ্বজোড়া নাম। অথচ তাঁদের চোখের সামনে থেকেই চুরি হয়ে গেলো ফুটবলের সোনার পরী—জুলে রিমে ট্রফি।

রাত পোহাতেই খবর ছড়িয়ে পড়লো। সোনার পরী উধাও। শুধু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডই নয় পুরো ইংলন্ড দেশের মানমর্যাদা ধুলোয় মিশে যায় আর কী। ইংলন্ডের ফুটবল কর্তারা মুখ চুন করে ছুটোছুটি করছেন। যেভাবেই হোক সোনার পরী উদ্ধার করতে হবে। গোয়েন্দা পুলিশের দল ঝাপিয়ে পড়লেন। জুলে রিমে ট্রফি উদ্ধার করতে না পারলে মুখ দেখানোর আর জো থাকবে না। ইতালি পেরেছিলো হিটলারের নাৎসী বাহিনীর শোনদৃষ্টির সামনে থেকে সোনার পরীকে বাঁচাতে। কিন্তু সুসভ্য, সুভদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত ইংলন্ড কি পারবে না সোনার পরীকে খুঁজে বের করতে? লন্ডন শহর থেকে চিরকালের মতো উধাও হয়ে যাবে সোনার পরী? এরপর ইংলন্ডবাসী আর কখনো বড় মুখ করে কিছু বলতে পারবে না। সারা বিশ্ব ছিঃ-ছিঃ করবে।

সারা বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবল উৎসাহী তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁরা আশা করছেন যে কোনো মুহূর্তে ইংলন্ড থেকে খবর আসবে। কিন্তু খবর আর আসে না। এদিকে দিন কেটে রাত নামে। রাতও পুরে যায় একসময়। নতুন দিনের সূর্যের পরশে ঝলমল করে উঠলো লন্ডন শহর। কিন্তু শহরবাসীর মুখে হাসি নেই। দুশ্চিন্তায় শোকে মুহুমান তাঁরা। উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার খোঁজ নিচ্ছেন রানী নিজে। প্রধানমন্ত্রী ছটফট করছেন। গোয়েন্দা আর পুলিশের নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। দিনরাত তাঁরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। কিন্তু কোথায় সোনার পরী! কোনো খোঁজই পাচ্ছেন না তাঁরা। পথঘাটে, বাস, রেল স্টেশন, বিমানবন্দর সর্বত্র তাঁরা ওত পেতে বসে আছেন। তাঁদের নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। চোখে ঘুম নেই।

দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠার মুহূর্তে ভালদানো।



চোর বোধহয় ভাবতেও পারেনি যে একটা সামান্য ট্রফি নিয়ে এমন হৈচৈ হবে। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো, ধরা পড়লে আর দেখতে হবে না। রাতারাতি সারা পৃথিবী তাকে চিনে ফেলবে। সোনার পরীর চোরের পক্ষে তারপর বেঁচে থাকাই মুশকিল হবে। তাই ভীত চোর রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি একটি পার্কে গিয়ে গাছ-গাছালির আড়ালে ট্রফিটি লুকিয়ে রেখে এলো। সে ভেবেছিল, পুলিশের নজর ওখানে পৌঁছবে না। বিশ্বকাপের খেলা হয়ে যাবার পর হৈচৈ থিতুিয়ে এলে সে ধীরেসুস্থে ট্রফিটি পার্ক থেকে নিয়ে যাবে। তারপর গলিয়ে ফেলে সোনটা বিক্রি করে দেবে। ট্রফিটি লুকিয়ে ফেলে চোর অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

ওদিকে রোজ সকালবেলায় সেই পার্কে বেড়াতে আসতেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে থাকতো তাঁর কুকুর পিক্লস। পার্কে এসে ভদ্রলোক রোজই পিক্লসকে ছেড়ে দেন। সেদিনও দিয়েছিলেন। নিজের মনে খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে পিক্লস। সেদিনও ছুটোছুটি করতে করতে পিক্লস হঠাৎ ঢুকে পড়লো গাছপালায় ঢাকা একটা জায়গায়। ঢুকলো তো ঢুকলোই। বেরোবার নামটি করে না। ওদিকে ততোকক্ষণে ভদ্রলোকের বেড়ানো হয়ে গেছে। এবার বাড়ি ফিরে যাবেন। ডাকতে লাগলেন পিক্লসকে। কিন্তু কোথায় সে? অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সে যখন সেই ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার মুখে একটা যেন কী। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন, কুকুরের মুখ থেকে জিনিসটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলেন। সকালের তাজা রোদে তাঁর চোখের সামনে ঝলমল করে উঠলো ফুটবলের সোনার পরী।

প্রথমটায় ভদ্রলোক নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। তারপর কুকুর আর সোনার পরীকে নিয়ে ছুটলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে।

জার্মানির বার্থহোল্ড-কে বাধা দিচ্ছেন চেকোস্লোভাকিয়ার নব্রিসেক।



কলম্বিয়ার ভালদারামা।

মুহুর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেলো সেই খবর। খুঁজে পাওয়া গেছে সোনার পরীকে। একটা পার্কে ঝোপের আড়াল থেকে তাকে খুঁজে বের করেছে একটা ছোট কুকুর। নাম তার পিক্লস।

জাতীয় কলেঙ্কারির হাত থেকে ইংলন্ডকে বাঁচালো পিক্লস। রাতারাতি সে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে তার মালিকও। কাগজে কাগজে ছাপা হলো তাদের ছবি। ইংলন্ডের ফুটবল কর্তারা পিক্লস আর তার মালিককে দুটো ভি আই পি টিকিট দিলেন। বিশ্বকাপের সময় হামেশাই পিক্লসকে দেখা যেতো একটা চেয়ারে গ্যাত হয়ে বসে আছে। পাশের চেয়ারে বসে আছেন তার মালিক। খেলার সময় টিভির ক্যামেরা ঘুরে ফিরে পিক্লসের ওপর বারবার ফোকাস করতো। দর্শকরাও পিক্লসকে দেখতে আসতেন। সব মিলিয়ে সে এক দারুণ ব্যাপার। পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ পিক্লসকে হিরো বানাতেও একজন কিন্তু তার ওপর ভীষণ চটে উঠেছিলো। সে যে সেই পরী-চোর—সে কথা বোধহয় না বললেও চলে।

এরপর ১৯৭০ সালে পেলের হাত থেকে সোনার পরীকে আর বাঁচানো গেলো না। সেবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিন তিনবার বিশ্ব বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ সোনার পরীকে চিরকালের মতো নিজের দেশে নিয়ে গেলো ব্রাজিল দল। শেষ হলো সোনার পরীর যুগ। সোনার পরীর বদলে এখন এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ। সেই কাপটাই সামনে রেখে বিশ্বের সেরা চক্কিটি দেশ এবার মাঠে নামছে। কে পাবে ফিফা বিশ্বকাপ জানতে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা যে সেইদিন।



৯০ এর বিশ্বকাপজয়ী জার্মান দল

এক নজরে এর আগের আগের বার

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স	ফলাফল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪-২
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোশ্লোভাকিয়া	২-১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	হাঙ্গেরি	৪-২
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	২-১
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	পশ্চিম জার্মানি	হাঙ্গেরি	৩-২
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল	সুইডেন	৫-২
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩-১
১৯৬৬	ইংলন্ড	ইংলন্ড	পশ্চিম জার্মানি	৪-২
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	ইতালি	৪-১
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	পশ্চিম জার্মানি	হল্যান্ড	২-১
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	হল্যান্ড	৩-১
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	৩-১
১৯৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা	পশ্চিম জার্মানি	৩-২
১৯৯০	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	আর্জেন্টিনা	১-০

* ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়নি।



গোল করার পর গুলিট

উক্তি

বিশ্বকাপে খেলা যে কোনো খেলোয়াড়ের স্বপ্ন। তা আমি যদি আরও একবার খেলার সুযোগ পাই তাহলে ছাড়বো কেন?

দিয়েগো মারাদোনা

(কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে)

মারাদোনা দলে থাকলে আমার চিন্তা কমে যায়। ও একা খেলে না। ও পুরো দলটাকেই খেলায়।

অ্যালফিও বেসিলি

(নিজের দলের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

বিশ্বকাপ যেখানে হয় সেই স্থান আমার কাছে পবিত্র তীর্থভূমি। আমি তো খেলা দেখতে যাবোই।

পেলে

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

অনেক তো বড় বড় কথা বলাবলি হচ্ছে। খেলা আরম্ভ হোক তারপর বোঝা যাবে কতো ধানে কতো চাল। কারণ বিশ্বকাপ মানেই অঘটনের রাজত্ব। গতবার প্রথম খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার কথা কি ভোলা যায়?

রজার মিল্লা

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

কে জিতবে? তাই কি বলা যায়? জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইতালি, হল্যান্ড—কেউই তো ছেড়ে কথা বলবে না। তবে মারাদোনো যদি ভালো খেলেন তাহলে কিন্তু সব বিশেষজ্ঞকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে।

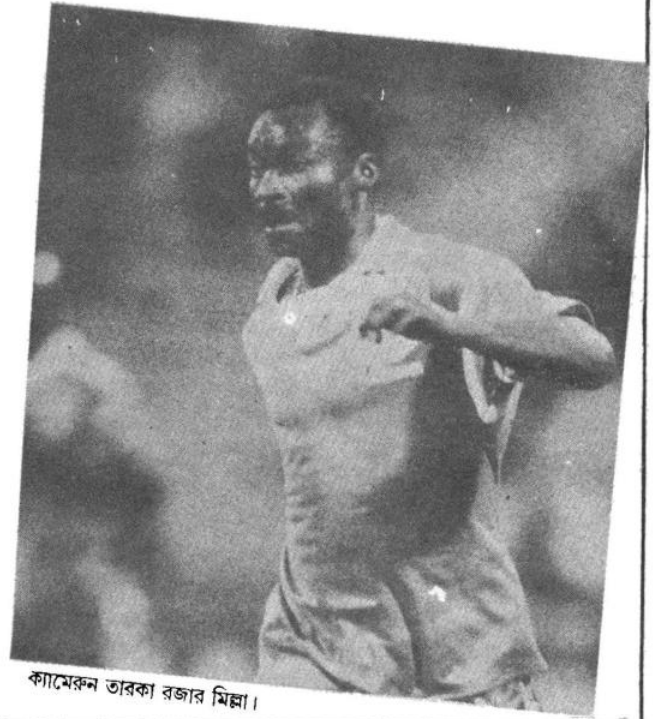
ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার

(বিশ্বকাপ নিয়ে বলতে গিয়ে)

বিশ্বকাপ এসে গেছে। এখন আর কোনো কথা নেই। সারা বিশ্ব এখন এক মাস ধরে এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মেতে থাকবে। বিশ্বকাপের বছরে উইন্ডলডনও তেমন জমে না। কারণ এই একটা মাস খেলাধুলার আসর আলো করে থাকে বিশ্বকাপ আর তার নায়করা। তাই আমরাও এখন তৈরি।

শৈলেন মাম্মা

(সম্প্রতি কথা প্রসঙ্গে)



ক্যামেরুন তারকা রজার মিল্লা।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন :

- ১) ফিফা বিশ্বকাপ কোন সালে প্রবর্তিত হয়?
- ২) পেলে শান্তি পুরস্কার কোন সালে পান?
- ৩) ইতালি যে তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে—সেই তিনবার তাদের অধিনায়কের নাম কি?
- ৪) কোন দুটি দেশ দু দুবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও জিততে পারেনি?
- ৫) পেলের জন্ম কতো সালে?
- ৬) উদ্যোক্তা দেশ হিসেবে অর্থাৎ দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতেছে কোন কোন দেশ?
- ৭) ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি কতো বার করে বিশ্বকাপ জিতেছে?
- ৮) বিশ্বকাপের একটি আসরে সব থেকে বেশি গোল করার রেকর্ড কার?
- ৯) বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম আত্মঘাতী গোলটি করেন কে?
- ১০) ব্রাজিল যে তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে সেই তিনবার তাদের অধিনায়ক কে কে ছিলেন?
- ১১) আর্জেন্টিনা কার কার নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জয় করেছে?
- ১২) ফিফা বিশ্বকাপ তৈরি করতে কতো খরচ হয়েছে?
- ১৩) মিশিয়ে জুলে রিমে কতো বছর ফিফার সভাপতি ছিলেন?
- ১৪) কাকে ইতালির সেরা কোচ বলা হয়?
- ১৫) বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম গোলটি করার কৃতিত্ব কে অর্জন করেছেন? তিনি কোন দেশের?

- ১) ১৯৩০। ফ্রান্সে। (৩৫)
- ২) ১৯৮৩। (৪৫)
- ৩) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (৪৫)
- ৪) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ৫) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ৬) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ৭) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ৮) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ৯) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১০) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১১) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১২) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১৩) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১৪) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)
- ১৫) ১৯৩৪। ১৯৩৮। ১৯৮২। (২৫)

ঃ চিত্র



॥ আমেরিকানা '৯৪ ॥

অরুণাভ গুপ্ত

বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে চায় না এমন মানুষ মোটা টাকার বাজি রেখে বলতে পারি পৃথিবীতে একজনও নেই। ছোট-বড়-মাঝারি সাইজের টিভির সামনে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে বসে আছে সব। যাদের বাড়িতে টিভি নেই তারাও দিব্যি খোসমেজাজে অন্যের বাড়িকে নিজের মনে করে রেগুলার হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন। না না, বিশ্বকাপ চলাকালীন কেউই এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ ফুটবল তখন সব বয়সের মানুষকেই আত্মীয়তার শক্ত দড়িতে আঁটেপুটে বেঁধে ফেলে। তবে বিশ্বকাপ শুরু হলে পাক্কা একটা মাস কিন্তু আমাদের অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। যেমন ঘরে বাইরে কাজকর্মে মন বসে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শিকেয় তুলে রাখতে হয়। দফায়-দফায় চা সাপ্লাই করতে করতে অন্দরমহলের এ টু জেড মুখ হাঁড়ি করেন। ইলেকট্রিকের বিলও দমাদম দ্বিগুণ হয়ে যায়।

'লাস ভেগাসের কনভেনশন হল'-এ '৯৪ ওয়ার্ল্ড কাপে কে কোন গ্রুপে খেলবে তার ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে গেল। নাচে-গানে-অর্কেস্ট্রায় মাতলেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। আর টিভির কল্যাণে সাক্ষী রইলেন বিশ্বের তামাম মানুষ। কোনো রকম নয়-ছয় মার্কী পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তাহলে দেখা যাক, কোন দেশের ভাগ্যে এবার কোন গ্রুপের শিকে ছিড়লো। আয়োজক দেশ আমেরিকা এ গ্রুপে মোকাবিলা করছে সুইজারল্যান্ড, কলম্বিয়া এবং রোমানিয়ার সঙ্গে। পারবে কি আমেরিকা দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে? আমেরিকানদের কিন্তু নিজেদের খেলোয়াড়দের ওপর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। এমনকি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিটন তো বলেই ফেললেন, 'আমেরিকান সকারের আমি বকবকে ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্রয়োজন শুধু একটু জ্বলে ওঠা। বাস, তাহলেই মার দিয়া কেজা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ফের যোগ করেছেন, 'আমার মেয়ে চেলসা কিন্তু যুব ফুটবল খেলেছে তা কি জানেন?' তবে ব্রাজিল, জার্মানি, আর্জেন্টিনা এবং নেদারল্যান্ড ফুসফুসে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ভরে নিয়ে খেলবে। কিন্তু হট ফেভারিট ইতালি এবার রীতিমতো ফৌতফৌতানি শুরু করে দিয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি পাঞ্জা লড়তে হবে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং মেক্সিকোর সঙ্গে। ইতালি প্রফেশনাল সকার-এ ওস্তাদ এবং ওদের খেলার স্টাইল প্লাস হার্ড-ট্যাকলস সহ্য করার ক্ষমতা অসাধারণ। তা সত্ত্বেও গ্রুপটা অন্যান্যদের তুলনায় বেশ কিছুটা শক্ত। মানে সহজে তুড়ি মারাটা হবে না ইতালির ক্ষেত্রে। অবশ্য জার্মানির একটা শক্ত গাঁট হচ্ছে বলিভিয়া। আর ব্রাজিলের সুইডেন। তবে আর্জেন্টিনার সে চিন্তাটুকুও নেই। তাহলে কোন দেশ কোন গ্রুপে সেদিকে নজর দেওয়াই ভালো।

গ্রুপ 'এ'/ইউনাইটেড স্টেটস, সুইজারল্যান্ড, কলম্বিয়া এবং রুমিনিয়া।

গ্রুপ 'বি'/ব্রাজিল, রাশিয়া, ক্যামেরুন ও সুইডেন।

গ্রুপ 'সি'/জার্মানি, বলিভিয়া, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া।

গ্রুপ 'ডি'/আর্জেন্টিনা, গ্রীস, নাইজেরিয়া, বুলগেরিয়া।

গ্রুপ 'ই'/ইতালি, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, মেক্সিকো।

গ্রুপ 'এফ'/বেলজিয়াম, মরক্কো, নেদারল্যান্ডস এবং সৌদি আরব।

গ্রুপ অনুযায়ী প্রাথমিক পর্বের খেলা এবং নিজের দল সম্পর্কে

কোচদের মতামত জেনে রাখলে মনে হয় লাভ বই তো ক্ষতি হবে না।

বার্টি ভোগ্‌স (জার্মানি): লটারিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ খুশি। এ যেন মনে মনে যা চাইছিলাম তা হাতে পেয়ে গেছি। মানে সত্যি বলতে কি দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার ব্যাপারে আমি অনেকটাই আশাবাদী। অঘটন ঘটলেও। আসলে কি জানেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের শুরুর ক্ষেত্রে সবসময় বাড়তি একটা চাপের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। সেদিক থেকে আমরা যথেষ্ট স্বস্তিতে রইলাম। তবে চার বছর ধরে জার্মানি ওসব চাপ-টাপের টেনশন গা-সওয়া করে নিয়েছে।

বোরা মিলিউতিনোভিক্‌ (ইউ এস): সোজা কথায় আমাদের পাঁচ পয়েন্ট দরকার দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার জন্য। সেটা আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে। তাছাড়া যে যাই বলুক কলম্বিয়াকে হারানোটা এমন একটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এবং জেনে রাখুন তা আমরা করবই।

জ্যাবিয়ার আজকারগোর্ডা (বলিভিয়া): হাঃ-হাঃ! লোকে ধরেই নিয়েছে আমরা তৃতীয় স্থানের জন্য লড়ছি। কখনোই নয়। বলিভিয়ার নাম দেখবেন একেবারে প্রথমে।

ডিক অ্যাডভোকাট (নেদারল্যান্ডস): আমরা বেলজিয়ামের নাড়িনক্ষত্র জানি। আবার সৌদি আরবের কোচের হাঁড়ির খবরও রাখি। সুতরাং গড়গড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যাচ্ছি।

অ্যালফিও বেসিলি (আর্জেন্টিনা): সবাই ভাবছে আমাদের গ্রুপটা খুব সহজ-সরল। কিন্তু আমি বলছি তাঁদের ধারণা অত্যন্ত ভুল। হেলাফেলা করার মতন কেউই নেই গ্রুপে।

অ্যারিগো সাজি (ইতালি): যদিও আমাদের গ্রুপ সত্যিই কঠিন, তাহলেও আমরা উঠছি। আসলে তিন-তিনটে শক্ত বাধা ইতালিকে পেরোতে হবে। সেক্ষেত্রে সস্তায় বাজিমাত অসম্ভব।

পল ভ্যান হিমস্ট (বেলজিয়াম): আমাদের জবরদস্ত প্রতিপক্ষ হচ্ছে নেদারল্যান্ডস। ওদের স্ট্রাইকাররা বিশ্বখ্যাত। তবুও দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছি। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, সেটা হলো আমাদের প্রথম দুটো খেলা ওরল্যান্ডোতে সাড়ে বারোটোর কাঠফাটা রোদ্দুরে খেলতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো গরমে খেলতে এমনিতেই অভ্যস্ত। এটাই বেলজিয়ামের মাইনাস পয়েন্ট।

জ্যাক চার্লটন (আয়ারল্যান্ড): বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ইতালি। কন্সনকালেও তাঁদের হারাতে পেরেছি কিনা অন্তত আমার জানা নেই। পাশাপাশি মেক্সিকো সম্পর্কেও আমার ধারণা অত্যন্ত অল্প। সেক্ষেত্রে দেখা যাক সবুরে কি মেওয়া ফলে।

অ্যাম্পেতল আয়োরডানেস্কু (রোমানিয়া): আমার ভাবতে দারুণ লাগছে এই প্রথম আমরা ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলবো। আশা করছি ইনডোরস-এ আমরা নিজেদের সড়গড় করে নিতে পারবো। আর দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী নিশ্চয়ই।

রয় হজসন (সুইজারল্যান্ড): দেখুন একটা কথা পরিষ্কার বলছি, যে কোনো দলের কাছেই ইউ এস এ একটা জঘন্য প্রতিপক্ষ। আর ইনডোরস খেলার ব্যাপারটা আমাদের কাছে দারুণ আনন্দদায়ক ঠেকেছে।

ক্লিমেনস ওয়েস্টারহক (নাইজেরিয়া): আমি হলফ করে বলতে পারি আমরা '৯০-এর ক্যামেরুন দলের চেয়ে হাজার গুণ ভালো। তবে অন্যান্য দলকে বিচার করতে যাওয়াটা আমার কাছে নিছক মুখামি বলে

মানে হয়। এটা একটা নিতান্তই বাজে কাজ।

আবদেল্লা ব্রিনদা (মরক্কো): অন্যান্য দলকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। মানে গ্রুপের সব কটাকেই সমানভাবে নিচ্ছি।

লিও বেনহাফার (সৌদি আরব): এই মুহূর্তে আমি আমার নিজের দলের চেয়ে অন্যান্য দেশের দল সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সৌদি আরব এশিয় চ্যাম্পিয়ান। সেক্ষেত্রে মোটেই ফ্যালনা নয়। তবে এটা আমি ভাল বুঝি বা জানি আমাদের এখনো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই নিজের ফুটবলারদের আমি সেভাবেই দেখভাল করছি।

বিশ্বকাপের লড়াই চব্বিশটি দলের আগেকার সংক্ষিপ্ত ফলাফল এই সুযোগে বলে দেওয়া যেতে পারে।

আর্জেন্টিনা/খেলেছে ১০ বার। চ্যাম্পিয়ন/১৯৭৮ ও ১৯৮৬। রানার্স আপ/১৯৩০, ১৯৯০। বেলজিয়াম/খেলেছে ৮ বার। উল্লেখযোগ্য ফল/১৯৮৬ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার। ব্রাজিল/খেলেছে ১৪ বার। চ্যাম্পিয়ন/১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০। রানার্স আপ/১৯৫০। কলম্বিয়া/খেলেছে ২ বার। সেরা ফল/১৯৯০-তে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া। দক্ষিণ কোরিয়া/খেলেছে ৩ বার। সেরা ফল/১৯৮৬-তে প্রথম রাউন্ড ম্যাচে বুলগেরিয়ার সঙ্গে ড্র করা। সুইডেন/খেলেছে ৮ বার। উল্লেখ্য ফল/১৯৫৮-তে রানার্স আপ। সুইজারল্যান্ড/খেলেছে ৬ বার। সেরা ফল/১৯৫৮-তে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া। ইউনাইটেড স্টেটস/খেলেছে ৪ বার। সেরা ফল/১৯৩০-এ সেমিফাইনালে ওঠা। জার্মানি/খেলেছে ১২ বার (পূর্ব জার্মানির ১ বারটা হিসেবে নেওয়া হয়নি)। চ্যাম্পিয়ন/১৯৫৮, ১৯৭৪, ১৯৯০। রানার্স আপ/১৯৬৬, ১৯৮২ এবং ১৯৮৬। স্পেন/খেলেছে ৮ বার। সেরা ফল/১৯৫০-এ চতুর্থ স্থানে ওঠা। ইতালি/খেলেছে ১২ বার। চ্যাম্পিয়ন/১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২। রানার্স আপ/১৯৭০। গ্রীস/এই সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ খেলেছে। মেক্সিকো/খেলেছে ৯ বার। উল্লেখ্য ফল/১৯৮৬-তে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা। বুলগেরিয়া/খেলেছে ৫ বার। সেরা ফল/১৯৮৬-তে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া। ক্যামেরুন/খেলেছে ২ বার। উল্লেখ্য ফল/১৯৯০-তে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা। আয়ারল্যান্ড/১ বার খেলেছে। সেরা ফল/১৯৯০-তে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া। বলিভিয়া/এই প্রথম খেলেছে। মরক্কো/২ বার খেলেছে। সেরা ফল/১৯৮৬-তে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা। নেদারল্যান্ডস বা হল্যান্ড/৫ বার খেলেছে। উল্লেখ্য/রানার্স আপ ১৯৭৪, ১৯৭৮। নাইজেরিয়া/এই প্রথম খেলেছে। নরওয়ে/১ বার খেলেছে। রুমানিয়া/৫ বার খেলেছে। সেরা ফল/১৯৯০-তে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হওয়া। রাশিয়া/আগে বিশ্বকাপ খেলেনি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু ৭ বার খেলেছে। সৌদি আরব/প্রথম খেলেছে।

এবার বিশ্বকাপ ১৯৯০-তে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির ওপর এককলক দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া যাক।

(১) একটা ম্যাচে সবচেয়ে কম সময় খেলা হয়েছে/৪৯ মিনিট, ইংল্যান্ড বনাম আয়ারল্যান্ড।

(২) দ্রুততম অতিরিক্ত/১০ মিনিট। নেরু পম্পিদো। আর্জেন্টিনা বনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন।

(৩) সর্বাধিক উপস্থিতি/৭৪,৭৬৫। যুগোস্লাভিয়া বনাম জার্মানি।

(৪) সর্বনিম্ন উপস্থিতি/২৭,৮৩৩। যুগোস্লাভিয়া বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহী।

(৫) সবচেয়ে বেশি অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে নামা/৫ বার। জন অ্যালরিজ/আয়ারল্যান্ড।



সোনার পর্দা হাতে পেলে।

(৬) অতিরিক্ত হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার উপস্থিতি/রজার মিল্লা। ৫ বার। ক্যামেরুন।

(৭) হেড দিয়ে সবচেয়ে বেশি গোল/৫ বার। টমাস স্কুরেভি/চেকোস্লোভাকিয়া।

(৮) সবচেয়ে বেশি অর্থ/পশ্চিম জার্মানি বনাম আর্জেন্টিনা/৮,৫৭৮,৩২৬,০০০ লিরা।

(৯) সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় মাঠের বাইরে গেছে/আর্জেন্টিনা।

(১০) মাঠের বাইরে যারা গেছেন/অ্যাংলেকানা বিইক (ক্যামেরুন বনাম আর্জেন্টিনা), বার্নার্ড ম্যাসিং (ক্যামেরুন বনাম আর্জেন্টিনা), এরিক ওয়েনালডা (ইউ এস এ বনাম চেকোস্লোভাকিয়া), ভ্যালেরি বেসনড (সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম আর্জেন্টিনা), এরিক গারেটস (বেলজিয়াম বনাম উরুগুয়ে), পিটার আর্টনার (অস্ট্রিয়া বনাম ইউ এস এ), খালিল মুবারক (ইউ এ ই বনাম যুগোস্লাভিয়া), যুন-ডিউক-ইও (দক্ষিণ কোরিয়া বনাম উরুগুয়ে), রিকার্দো গোমেজ (ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা); ফ্রাঙ্ক রিকার্ড (হল্যান্ড বনাম জার্মানি), রুডি ভয়লার (জার্মানি বনাম হল্যান্ড), রেফিক সাবানাজোভিক (যুগোস্লাভিয়া বনাম আর্জেন্টিনা), লুবোমির মোরাভিক (চেকোস্লোভাকিয়া বনাম জার্মানি), রিকার্দো গুস্তি (আর্জেন্টিনা বনাম ইতালি), পেড্রো মন্জন্ (আর্জেন্টিনা বনাম জার্মানি), গুয়েস্তাভো ডেজনেট (আর্জেন্টিনা বনাম জার্মানি)।



ফ্রাঙ্কোইস ওমান বিইক

এটা অনেকটা ডঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের গল্পের মতো কিংবা মহাত্মার তের কুরু-পাণ্ডবের মতো। এক ভাই যখন সাফল্যের চূড়ায় আর এক ভাই তখন নিন্দার মুখে। অথচ দুই ভাইয়ের একজনকেও বাদ দিলে সম্পূর্ণ হয় না বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিজয়কাহিনী। একজনের নাম ফ্রাঙ্কোইস ওমান বিইক আর একজনের আন্দ্রে কানা বিইক। একজন আটশ ছুইছুই করছেন। আর একজন রয়েছে তার চেয়ে ৯ মাসের তফাতে।

১৯৯০ সালে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই শিরোনামে চলে এসেছিলেন দুই ভাই। ফ্রাঙ্কোইস প্রথম ম্যাচে গোল করে ৮৬-র বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দেন। আর ক্যানিগিয়াকে ফাউল করার অপরাধে ৯০-এর বিশ্বকাপে প্রথম লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল আন্দ্রেকে। গোল করে যতটা খুশি হয়েছিলেন ফ্রাঙ্কোইস, গোলের ৪ মিনিট আগে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ততটাই দুঃখ পেয়েছিলেন আন্দ্রে। সব দুঃখ অবশ্য ভুলে গিয়েছিলেন ভাইয়ের ঐ দুর্দান্ত গোল দেখে।



আন্দ্রে কানা বিইক

বাবা ফুটবল খেলতেন, কিন্তু সেটা নিতান্তই আনন্দের জন্য। কোনোদিনই ভাবেননি দুই ছেলে আন্দ্রে আর ফ্রাঙ্কোইস ফুটবল খেলবে। তাই স্কুলের পড়ায় ফাঁকি দিয়ে ছোটবেলায় ফুটবল খেলে বেড়ানোর জন্য বাবার কাছে জুটেছে বেধড়ক পেটানি। দু ভাইয়ের তখন একমাত্র কাজই ছিল রাস্তায় বল নিয়ে নেমে পড়া। কখনো হুট দিয়ে বা লাঠি দিয়ে বানিয়ে নিতেন গোলপোস্ট। আন্দ্রে আর ফ্রাঙ্কোইস দুঃখ করেন ছোটবেলায় ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের মতো ফুটবলে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি বলে। আসলে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশ আফ্রিকার ক্যামেরুনে তখন ফুটবল খেলাটাই ছিল একটা বাড়াবাড়ি। বাবা অবশ্য পরবর্তীকালে খুশি হয়েছিলেন যখন দুই ছেলেই ফুটবল অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে যায়।

দুজনে খেলতে শুরু করেন স্থানীয় দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব পৌমার হয়ে। ফ্রাঙ্কোইস নিজের গোলপুখার জন্যে বেছে নেন স্ট্রাইকার পজিশন। কুশলী আন্দ্রে তাঁর ড্রিবল আর মারাত্মক শট নিয়ে চলে আসেন মাঝ মাঠে। ১৯৯০-এর বিশ্বকাপ চলার সময়

ক্যামেরুনের জোড়া তারকাঃ বিইক ভাইয়েরা

সুমন ভট্টাচার্য

দু-ভাই খেলছিলেন ফ্রান্সের লীগে। ফ্রাঙ্কোইস খেলতেন লাভালে আর আন্দ্রে তৃতীয় ডিভিশনের মেটজ ক্লাবে। ফ্রাঙ্কোইসকে দলে টানার জন্য বিশ্বকাপের আগে আগ্রহ দেখিয়েছিল পর্তুগালের পোর্টো আর নাস্টেসের মতো বিখ্যাত ক্লাব। কিন্তু ফ্রাঙ্কোইসের কাছে অর্থের চেয়েও বেশি মূল্যবান ছিল মানসিক শান্তি। তাই টেনশন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে বিশ্বকাপের খ্যাতির পরও খেলেছেন ফ্রান্সের তুলনায় ছোট ক্লাব রেনেসের হয়ে। আন্দ্রে চলে গেছেন লে হার্তে ক্লাবে। যদিও ধার হিসেবে। মেটজ আবার আন্দ্রেকে ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করছেন।

ফ্রাঙ্কোইসের সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে যে তিনি স্ট্রাইকার বলে অপর স্ট্রাইকার মিল্লাকে মোটেই পছন্দ করেন না। একবার তিনি বলেছিলেন গত বিশ্বকাপে মিল্লার চমৎকার সাফল্য আসলে দলগত সংহতির অবদান। কিন্তু নিজের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর চমৎকার সম্পর্ক। দুজনের যোগাযোগ যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা এবং এই যোগাযোগ বহু সাফল্য এনে দিয়েছে ক্যামেরুন দলকে। গত বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে এই সুবাদেই ফ্রাঙ্কোইস করেছিলেন ১২টি গোল, এবার তারচেয়ে কিছু কম। হল্যান্ডের স্বেতকায় কোম্যান ভ্রাতৃত্বের চেয়ে তাই খুব একটা পিছিয়ে নেই ক্যামেরুনের ভ্রাতৃত্ব ফ্রাঙ্কোইস আর আন্দ্রে।



পড়ার সঙ্গে খেলা কৃষ্ণনগর হাই স্কুল

স্বপন বকসী

পঞ্চাশ বছরের পুরনো কৃষ্ণনগর হাই স্কুল শুধুমাত্র কৃষ্ণনগরবাসীদের নয়, বর্তমানে সারা নদীয়া জেলাতেই এক পরিচিত নাম। প্রতি বছর এই বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে ভাল ফলাফল করে। ৯৩'-এর মাধ্যমিকে অধিকাংশ ছাত্র ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। তিন জন ছাত্র স্টার পেয়েছে। সুব্রত সাহা কৃষ্ণনগরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৪৮ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা নদীয়া জেলার স্কুল ক্রীড়াসংস্থার সহ-সচিব সমীর বিশ্বাস বিদ্যালয়ের খেলাধুলার সাফল্য সম্পর্কে বলেন, সি-এ-বি স্কুল ক্রিকেটে কৃষ্ণনগর হাই স্কুল এই বছর জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রানাঘাটের লাল গোলাপ স্কুলকে হারিয়ে। এর আগে তারা আরো দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৮৮ এবং ১৯৯৩-তে। দেবমাল্য বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ সাহা, অমল কুণ্ডু জেলা স্কুল ক্রিকেটের কৃতি খেলোয়াড়। পাঁচ বছর আগে সাব জুনিয়র ক্রিকেটে সি-এ-বি-র দেওয়া সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পান এই স্কুলের ছাত্র রবীন্দ্রনারায়ণ দাস। ১৯৯১-তে আরেক ছাত্র

শিবেন্দু মুখার্জী আন্তঃরাজ্য স্কুল ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক হয়।

নদীয়া জেলা জুনিয়র ফুটবলে যারা নিয়মিত খেলছে তাদের মধ্যে রয়েছে কুন্তল বিশ্বাস, অরুণ দত্ত, দেবর্ষি বাগচী, প্রলয় বিশ্বাস ও সজল হালদার। জেলারও প্রতিনিধিত্ব করেছে এরা। এছাড়া গতবছর রাজ্য স্কুল ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে এই স্কুলের ছাত্র নিলয় মণ্ডল।

১৯৯২-তে তেহেটে অনুষ্ঠিত নদীয়া জেলা আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিকসে ৩৫ পয়েন্ট পেয়ে কৃষ্ণনগর হাই স্কুল জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়। কৃতি অ্যাথলিট তিলক পাল ৮০০ মিঃ ও ১৫০০ মিঃ দৌড়ে প্রথম হয়। মহানন্দ হালদার হাইজ্যাম্প প্রথম হয়ে রাজ্য পর্যায়ে অ্যাথলেটিকসে সাফল্য লাভ করে। সর্বভারতীয় স্কুল অ্যাথলেটিকসেও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে।

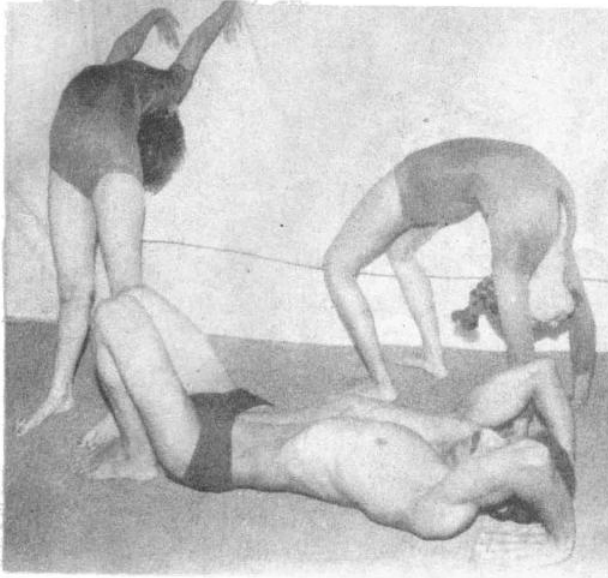
জাতীয় সঁতারে অংশগ্রহণকারী ও রাজ্য রেকর্ডের অধিকারী রাজীব দ্রাক্ষী ও নবীন দাস সর্বভারতীয় সঁতারের প্রতিযোগিতায় একাধিকবার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে সাফল্যলাভ করেছে।

যোগ ব্যায়ামে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দিবেন্দু পাল জেলায় প্রথম ও রাজ্যস্তরে যষ্ঠ স্থান লাভ করে।

১৯৯২তে এন-সি-সি পলাশীর মাঠে নকল যুদ্ধের আয়োজন করে। কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের শিক্ষক পান্মালাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই স্কুলের এন-সি-সি ক্যাডেটরা এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুমার শীল



চক্রাসন

তোমাদের বেশ কিছু চিঠি পাচ্ছি যারা বিভিন্ন যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছ বা করতে ইচ্ছুক। আবার কয়েকজন স্কুলের শরীর শিক্ষার পাঠ্যক্রমে চক্রাসন আছে বলে চক্রাসনের সঙ্গে আরও কয়েকটি আসন শিখতে চেয়েছ। আমি তোমাদের দাবি মেনে নিচ্ছি।

চক্রাসন

ছবির ডান দিকে শুধুমাত্র হাতের তালু আর পায়ের পাতা মাটিতে রেখে শরীরের অন্যান্য অংশ মাটি থেকে তুলে দিয়ে মেয়েটি যেভাবে করছে, সেটি চক্রাসন। এখন চক্রাসন করবে কি করে? আমি দুটি পদ্ধতি শেখাচ্ছি। যার যেটিতে সুবিধা সে সেভাবেই করবে।

প্রথম পদ্ধতি: মাটিতে ছেলেটির মতো পা দুটি ভাঁজ করে হাতের তালু দুটি মাথার দুপাশে মাটিতে পেতে শুয়ে পড়। দু পায়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখো প্রথম প্রথম। এখন হাত ও পায়ের জোরে কোমর, পিঠ, কাঁধ, মাথা মাটি থেকে তুলে দাও ডান দিকের মেয়েটির মতো। এভাবে নিজে থেকে তুলতে না পারলে অন্য একজনকে বলবে কোমর একটু তুলে দিতে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: দেওয়ালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা ও হাত উল্টে দু'হাত দিয়ে দেওয়ালটা ধর বাঁ দিকের মেয়েটির মতো। এবার ধীরে ধীরে হাতদুটিকে দেওয়াল ধরে ধরে নামাও

এবং ক্রমাগত নামিয়ে নিয়ে এস মাটিতে। এটিও চক্রাসন হলো। প্রয়োজনে কাউকে বলবে কোমরটা ধরে থাকতে। খুব সাবধানে করবে। দেখো যেন মাথায় চোট না লাগে। নিয়মিত অভ্যাসে দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চক্রাসন করতে পারবে। ইংরিজিতে এটিকে বলে Arch (আর্চ)। আসন অবস্থানে ১৫-২০ সেকেন্ড শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখ। এভাবে তিনমাত্রায় অভ্যাস কর।

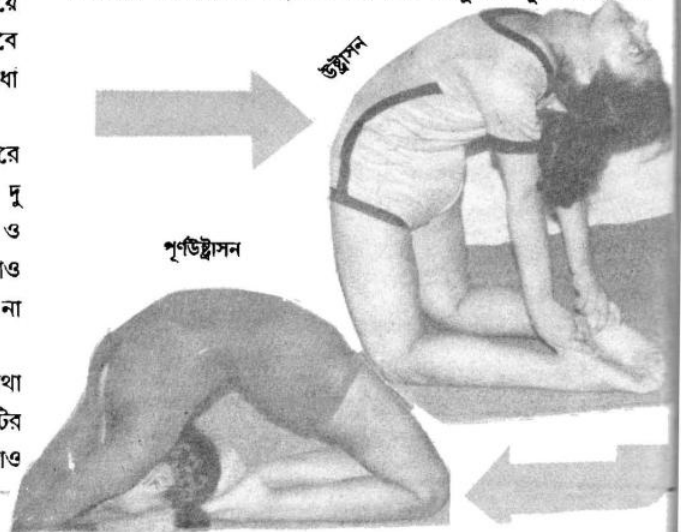
এই আসনে অস্থূল, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য রোগ দূর হয়। কোমর, পিঠ ও পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে। বৃকের খাঁচার গঠন হয় সুন্দর। শরীরের ক্ষিপ্ততা বাড়ায় ও শরীরকে করে নমনীয়।

উষ্ট্রাসন ও পূর্ণউষ্ট্রাসন

এখন আরেকটি আসন। ছবির ডানদিকের মেয়েটি রয়েছে উষ্ট্রাসনে আর বাঁ-দিকের মেয়েটি পূর্ণউষ্ট্রাসনে। প্রথমে হাঁটু মুড়ে 'knee-down' ভঙ্গিতে বসতে হবে যাকে বলে নতজানু। আমরা সবাই অল্পবিস্তর এই ভঙ্গিমার সঙ্গে পরিচিত আছি। এখন কোমর থেকে শরীরের উপর অংশটি ধীরে ধীরে পিছনে বেকিয়ে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধর। মাথা পেছন দিকে ঝুলিয়ে দাও যেমনটি রয়েছে ডানদিকের মেয়েটি।

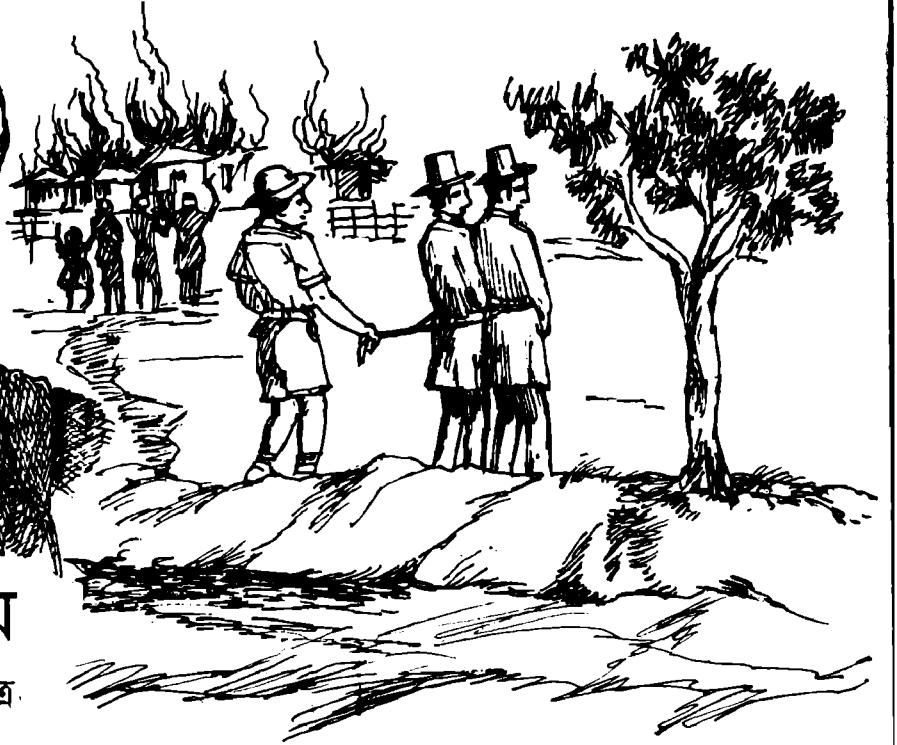
এরই উঁচু পর্যায়ে রয়েছে ছবির বাঁদিকের মেয়েটি। নতজানু হয়ে বসে আস্তে আস্তে শরীরটি পেছনদিকে বেকিয়ে হাতের তালু দুটি মাটিতে ফেলে দিয়ে আর্চ কর। পরে কপাল নামিয়ে নিয়ে এস দুপায়ের চোটের মাঝে আর চেষ্টা করো দুহাত দিয়ে দুপায়ের আঙুল ধরে নিতে। বাস, পূর্ণউষ্ট্রাসন হয়ে গেল। ছবিতে ভালো করে দেখ মেয়েটির হাতের কনুই দুটি মাটিতে পড়ে গেছে। ধৈর্যসহকারে নিয়মিত অভ্যাস কর। নিশ্চয়ই পারবে। যেভাবেই কর না কেন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১০-২০ সেকেন্ড থাক। পরে বিশ্রাম নাও সমমাত্রায়। আসন ও বিশ্রাম নিয়ে একবার হলো। দু-তিনবার অভ্যাস কর।

আসন দুটি করলে মুখের গঠন সুন্দর হয়। শিরদাঁড়া হয় নমনীয়। শ্বাসকার্যের সহযোগী পেশী ও স্নায়ুগুলি খুব ভাল হয়।





গল্প নয় প্রিয়রঞ্জন মৈত্র



একরোখা ছেলেটিকে নিয়ে দারুণ দুর্ভাবনা ছিল তার বাবার। তবে তিনি তা প্রকাশ করতেন না। এমন কি তাঁর মনোভাব জানতে দিতেন না স্ত্রীকেও। দূরে কর্মক্ষেত্রে থেকেও ওই ছেলেটি সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখতেন তিনি। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় বাপ-ছেলের সম্পর্ক এ কালের মতো এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। খুব কম ছেলেই তখন বাবার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পেত। তাদের যা কিছু আবদার মেটাতেন মায়েরাই।

সেই একরোখা ছেলেটিই যেদিন নিজের অসাধারণ মেধা বলে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেল সেদিন খুবই খুশি হলেন তার বাবা।

চাকরিস্থল বর্তমান বাংলাদেশের যশোহরে। যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল ছেলেটি। জিনিসপত্র গোছানো হলো।

যাত্রার আগে ছেলেটি হঠাৎ একপাত্র গঙ্গাজল মায়ের পায়ে ছুঁয়ে নিয়ে সেই জল ভরে নিল শিশিতে।

মা বললেন, গঙ্গাজল পায়ে ছোঁয়ালি!

ছেলে বলল, মা, তোমার চাইতে কি গঙ্গা বড় হতে পারে?

ছেলের এই কথার পর কী যে বলবেন তবে পেলেন না

মা।

এর পর ছেলে চলল বাবার ঘরে। মা চললেন তার পেছন পেছন।

বাবার ঘরে ঢোকান আগে পায়ের চটি বাইরে খুলে রাখল ছেলে। যেন মন্দিরে প্রবেশ করছে সে। বাবাকে প্রণাম করে

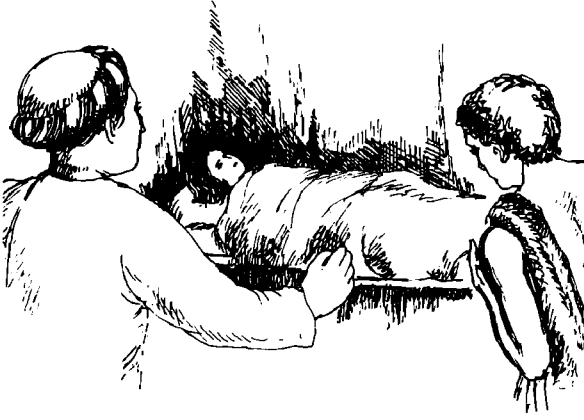
অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল ছেলে। কী যেন বলতে চায় সে। কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

তাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়ের বুঝতে অসুবিধা হলো না ছেলে কী চায়। তিনি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেন একপাত্র জল। সেই জল বাবার পায়ে ছুঁয়ে নিয়ে এবারও একটা শিশিতে ভরে নিল ছেলে। তারপর সেই দুটো শিশি সঙ্গে নিয়ে সে যাত্রা করল কর্মস্থলের উদ্দেশে।

ওই পাদোদকই যেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মপ্রেরণা। শাস্তিচিহ্নে পাদোদকের শিশি মাথায় ঠেকিয়ে নিতাদিন কাজ শুরু করতেন তিনি। তবে সেই শাস্তি চিহ্ন অশাস্ত হয়ে উঠত যে কোনো অন্যায় দেখলেই।

একবার কানে এলো নীলকর সাহেবেরা অত্যাচার শুরু করেছে তাঁর এলাকায়। নীলচায় করতে অস্বীকার করায় লোকজনকে ধরে মারছে তারা, ঘরবাড়ি লুণ্ঠ করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে!—এই সব সংবাদে অশান্ত হয়ে উঠল তাঁর চিত্ত। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। পুলিশ সঙ্গে নিয়ে নিজেই ছুটলেন ঘটনাস্থলে। অত্যাচারীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করে তবে শান্ত হলেন।

জ্যাঠতুতো ভাইয়ের এক কুটুম্বের সঙ্গে আলাপ হলো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের। আলাপ থেকেই ঘনিষ্ঠতা। যেন অনেক কালের পরিচয় তাঁদের। তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নৌকোয় চেপেই যাত্রায়াত করেন কর্মস্থলে। একদিন সেই কুটুম্বের ইচ্ছা হলো তাঁর নৌকোয় চেপেই একটা কাজ সেরে আসেন। তাঁর ইচ্ছার কথা জেনে রাজী হয়ে গেলেন ডেপুটি। নৌকোয় উঠলেন কুটুম্ব ভদ্রলোক।



তিনি দেখলেন মেয়েটিকে

কথায় কথায় তাঁর একটা ফৌজদারী মামলার কথা ডেপুটিকে শোনালেন তিনি। এ কথাও জানালেন যে মামলাটি ডেপুটির আদালতেই চলছে। সব শেষে তিনি অনুরোধ করলেন যাতে মামলাটিতে তাঁর পক্ষে রায় দেন ডেপুটি আর প্রতিপক্ষের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

ওই অনুরোধ শুনেই রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ডেপুটি। তিনি মাঝিদের হুকুম দিলেন সামনের জনহীন চড়ায় নৌকো ভেড়াতে। মাঝিরা ডেপুটির অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে তাড়াতাড়ি দাঁড় টেনে নৌকো ভেড়াল চড়ায়। এবার ডেপুটি মাঝিদের হুকুম করলেন কুটুম্বটিকে নৌকো থেকে ঠেলে ফেলে দিতে। মাঝিদের অবশ্য ওই অগ্রিয় কাজটা করতে হলো না। কুটুম্ব ভদ্রলোক পড়িমরি করে লাফিয়ে নামলেন নৌকো থেকে। নৌকোটা তাঁকে ফেলে রেখে আবার যাত্রা শুরু করল। মাঝিরা ভেবে পেল না ভদ্রলোক কী করে এই মাঝ নদী থেকে বাড়ি ফিরবেন। আর ডেপুটি তো সেই সব চিন্তা মনেই আনলেন না। সুযোগসন্ধানী কুটুম্বকে নৌকো থেকে তাড়িয়ে তখন স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

এ হেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মস্থল যখন মেদিনীপুরের নাগোয়ায়, তখন তাঁর এক দাদার কর্মস্থল ছিল তমলুকে। নাগোয়া থেকে তমলুকের দূরত্ব প্রায় চৌষট্টি কিলোমিটার। তখন পায়ে হেঁটে অথবা পাশ্চাতে যাতায়াত করত সকলে। দাদার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একদিন ভোরবেলা চেপে বসলেন পাশ্চাতে। ছুটল পাশ্চি। হ-হুম্ না... হ-হুম্ না... হ-হুম্ না—বেহারারা ছুটতে ছুটতে ভর দুপুরে যেখানে এসে থামল সেই জায়গার নাম নরঘাট। এই নরঘাট হলদি নদীর গায়ে। তমলুকে যেতে নদী পেরুতেই হবে।

খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখা গেল নৌকো আছে কিন্তু মাঝি নেই। মাঝিকে না পেয়ে ডেপুটি রাগে ফেটে পড়লেন। চাপরাসীকে বললেন, ‘যেখান থেকে পারিস ধরে নিয়ে আয় ফাঁকিবাজ মাঝিকে।’

হুকুম পেয়ে ছুটল লাঠি হাতে চাপরাসী। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে মাঝির বাড়ির পথ জেনে নিয়ে যখন কিছু দূর এগিয়েছে

সে তখনই দেখা হয়ে গেল মাঝির সঙ্গে। বাস, আর যায় কোথা! ডেপুটির চাপরাসী বলে কথা। লাঠির গোঁড়া মারতে মারতে সে মাঝিকে এনে হাজির করল ডেপুটির কাছে। ডেপুটির ধমকে মাঝি কঁদে কঁদে বলল যে, তার মেয়ের কলেরা হয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে দেখতেই বাড়ি গিয়েছিল। হজুর যেন তার অপরাধ ক্ষমা করেন।

কলেরা শুনে চমকে উঠল চাপরাসী বেহারার দল। কারণ তখনকার দিনে কলেরা-বসন্ত রোগ দুটোকে দারুণ ভয় পেত লোকেরা। ওই রোগ দুটো যে বাড়িতে হতো সেই বাড়ির আশপাশ দিয়ে কেউ হাঁটতে চাইত না।

মাঝির মেয়ের কলেরা হয়েছে শুনে ডেপুটির রাগ জ্বল হয়ে গেল। মাঝির সঙ্গে তিনি গেলেন তার বাড়ি। দেখলেন মেয়েটিকে। ডাকালেন গ্রামের ডাক্তার বন্দিদের। মেয়েটির ঠিক মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, মাঝির হাতে কিছু টাকা দিয়ে তবেই সেই বাড়ি থেকে বেরোলেন তিনি। সকলে অবাক হয়ে দেখল একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এই অদ্ভুত ব্যাপার-সাপার।

এমনি অবাক করার মতো আবার একটি ঘটনা ঘটলেন ডেপুটি।

তখন তাঁর কর্মস্থল হুগলী। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার মেলায় খুব ভিড় হতো সেই সময়। একদিন ডেপুটি দেখেন গঙ্গা পারাপারের একটা ছোট নৌকায় অনেক লোক উঠেছে। এই লোকদের অধিকাংশই এপারে এসেছিল মেলা দেখতে। এত যাত্রী উঠতে দেখে ডেপুটির মনে হলো নৌকোটা ডুবে যাবে। তিনি তাই চাপরাসী পাঠিয়ে নৌকার মাঝিকে অত লোক নিয়ে নৌকো ছাড়তে নিষেধ করলেন। কিন্তু মাঝি শুনল না তাঁর নিষেধ। নৌকো ছেড়ে দিল। দেখা গেল ডেপুটির আশঙ্কাই সত্য হলো। কিছুটা গিয়েই উল্টে গেল নৌকো। যাত্রীরা অনেক কষ্টে তীরে এসে পৌঁছুলো বটে, তবে তাদের মধ্যে কজন মারা গেল বোঝা গেল না।

ব্যাপার দেখে রাগে অস্থির হয়ে উঠলেন ডেপুটি। তাঁর নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হলো মাঝিকে। দায়ের করা হলো মামলা। মামলায় তিন মাসের কারাদণ্ড হলো মাঝির।

সেই মাঝির বাড়ি ছিল নৈহাটি। ডেপুটির বাড়ি থেকে কিছু দূরে। হঠাৎ একদিন ডেপুটি খবর পেলেন জেলেই মারা গেছে হতভাগ্য মাঝি। তার স্ত্রী দুই মেয়ে নিয়ে প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই খবরের সত্যতা যাচাই করে নিজের মাইনে থেকে প্রতিমাসে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ডেপুটি। যতদিন মাঝির স্ত্রী জীবিত ছিল প্রতিমাসে নিয়মিত পৌঁছুলো সেই টাকা। একটি মাসও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

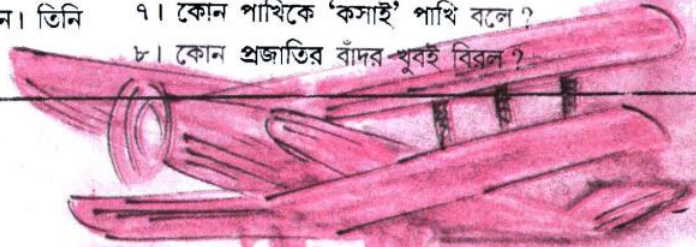
কিন্তু কে এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যিনি এইসব বিচিত্র ঘটনার নায়ক, যে ঘটনাগুলো গল্পের মতো মনে হয়? তিনিই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ছবি: নিমাই দাস

প্রশ্ন :

- ১। প্রাণিজগতের কোন সদস্যকে হাই-জাম্পিং চ্যাম্পিয়ন বলা হয়?
- ২। কে তাঁর অনিচ্ছুক কোচম্যানকে আকাশে ওড়ার অগ্রদূত হতে বাধ্য করেছিলেন?
- ৩। প্রথম সাবমেরিনটির চালক ছিলেন মাত্র একজন। তিনি কে?

- ৪। কোন আবিষ্কারটি রন্ধন ও শিক্ষার খুব উন্নতি করে?
- ৫। রেশম তৈরির রহস্য চিনারা গোপন রাখতে চেয়েছিল। কারা এই রহস্য উদ্ঘাটন করে?
- ৬। 'রোবট' শব্দটি কে তৈরি করেন?
- ৭। কোন পাখিকে 'কসাই' পাখি বলে?
- ৮। কোন প্রজাতির বাঁদর খুবই বিরল?



হুগো চ্যাপলিনের চিত্রনাট্যে 'চ্যাপলিন' নামের চরিত্রটি ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়। চ্যাপলিনের চরিত্রটি ১৯৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৯৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৯৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।



১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৬ সালে প্রদর্শিত হয়।

ছবি : সুফি

ক'মাস পরে আবার তার ছেঁড়া বুট নিয়ে বিলি এসে গেলো শুকতারার পাতায়



প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড স্ট কিনির একজোড়া ছেঁড়া বুট
খুঁজে পেয়েছিলো বিলি। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা
একদম ডেড স্টের মতো হয়ে যায়। বড়দিনের ছুটিতে বিলি
গেছে তার কাকার বাড়ি। কাকিমা কিন্তু ফুটবল খেলা একদম
পছন্দ করেন না। কাকার বাড়ির পাশের ছেলেরা বিলিকে
তাদের হয়ে খেলতে বলছে। বিলিও খেলবে। কিন্তু খেলার
আগের দিন সকালে কাকা আর কাকিমা বিলিকে নিয়ে.....



বিলি এটা দিয়ে তুই
ফুটবল খেলতে পারিস...
পায়ে একটু লাগবে এই যা!

কী আশ্চর্য! এই
কুঁড়েঘরটা এক সময়
আফ্রিকায় ছিলো...
কয়েকশ বছর...

তবে আমাদের বাড়ির
মতো নয়... হাঃ হাঃ হাঃ...



বিলি, এটা দ্যাখ—
পাখির পালকে তৈরি।
ওপরের শিং
লক্ষ্য করেছো?

ওঝারা
পরতো...



দিন শেষ হয়ে
এলো...
এসব দেখে কিছু
শিখলি বিলি?

খুব ভালো লেগেছে তাই না
বিলি? কি যে এসব ছাইপাশ
বল খেলিস?

খুব ভালো লেগেছে
কাকিমা। ধন্যবাদ...



বিলি তার ঘরে গেলো...

এই বুট-টুটগুলো কি
করে যে বাইরে নিয়ে
যাই কাকিমা দেখে
ফেললে আর দেখতে
হবে না। কাকিমা
খুব রেগে যাবেন—
তবু কাল আমি
খেলবোই...



পরদিন সকালে... এই মেঘলা দিনে
তুই কোথায় যাচ্ছিস বিলি?
গাঙা লাগবে যে!

না, এই একটু
হেঁটে আসছি। বাড়িতে
ভালো লাগছে না।

তাতাতাডি ফিরে আসিস।
বৃষ্টি হতে পারে...



বাইরের দরজা বন্ধ করে বিলি তার
খেলার জিনিসগুলো খুলে নিলো।

ভাগ্যিস এই
বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল!
এসব নিয়ে বেকতে গিয়ে
ধরা পড়লে কাকিমা
যে কি করতেন!



বিলি চটপট ওয়েভিল রোড ধরে মাঠের দিকে
এগিয়ে গেলো...

ওয়েভিল রোড। ডেড স্টও ছোটবেলায়
এখানে খেলতেন। এই রাস্তা দিয়ে তিনিও
একদিন হেঁটেছেন... আজ যেমন
আমি হাটছি।





গলায়-দড়ির আমবাগান

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সামনেই গলায়-দড়ির আমবাগান।' এই পথ দিয়ে আগে দু একবার গিয়েছে মিলন। তবে তা দিনের বেলায়। আজ অবশ্য অন্য পথ ধরেই গিয়েছিল বন্ধুর বাড়ি। বিয়েতে যেতে পারেনি তাই ছেলের মুখে-ভাতে যেতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। বন্ধিম শুধু তার সহপাঠী নয় স্কুলে পড়ার সময় অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু ছিল। সারাদিন থেকে বিকেলে ফেরবার কথা তুলতেই প্রথমে খুব জোরজোর করেছিল বন্ধিম, 'দেখ মিলন, কতকাল বাদে দেখা, এলি যখন একটা দিন থেকে যা।' থাকা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কথায়বর্তায় বেলা গড়িয়ে যায় দেখে বাধ্য হয়ে বলেছিল, 'যাবিই যখন, গলায়-দড়ির আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যা, এই পথটাই সহজ।'

ওই সহজ পথটাই সন্ধ্যা নামলে যে তার মতোই বন্ধিম হয়ে উঠবে তা কি সে ঘুগাঙ্করেও টের পেয়েছিল!

বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে মাঠে পড়তেই চক্ষুস্থির মিলনের। চৈত্র মাসের ফসল ওঠা ক্ষেত নয়, যেন ধু-ধু করা তেপান্তরের মাঠ। তাড়াতাড়ি পা চালান মিলন।

একটানা অনেকটা পথ হাঁটায় শরীর ক্লান্ত অবসন্ন। এতটা পথ এলো বটে কিন্তু মানুষজন চোখে পড়ল না একটা। ধান কেটে নেওয়া গাছের গোড়াগুলো উধাও। সুতরাং গরু-বাহুর যে এর লোভে আসবে তাও না।

মাঠ পার হতে হতেই কখন সুমি ডুবেছে টের পায়নি মিলন।

স্কুল জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে একেবারে গলায়-দড়ির আমবাগানের কাছে। কিন্তু পা আর চলে না। একটু বিশ্রামের দরকার। সামনে পাকুড় গাছটার তলায় বসে পড়ল মিলন। ওর পরিশ্রান্ত দেহটা শীতল করতে একটু হাওয়া দিল গাছটা তার পাতা কাঁপিয়ে। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কখন যে তন্দ্রা এসেছে টের পায়নি একটুও। হঠাৎ পঁচাত্তর ডাকে তন্দ্রা গেল ছুটে।

আরে বাবা! এ যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে! নিজের মনেই শোনাল নিজে। চোখ কচলে দেখল সন্ধ্যা নামলেও আকাশে চাঁদ উঠেছে। আবহা আলো আর অন্ধকারে গলায়-দড়ির আমবাগান সামনে দুলছে। মিলনের হঠাৎ ইচ্ছা হলো গান গাইতে। গান ধরলে তবু কিছুটা সাহস বাড়ে। মনে হয় সে একা নয় আরও কেউ আছে পাশে।

মানুষ না থাক পাকুড় গাছটা জানিয়ে দিয়েছে এই সেই আমবাগান। আর মাঠের ভয় নেই। এপাশে ওপাশে দু একটা ফসলী মাঠ। ওদিকে একটা মাঠে গম পেকে উঠেছে টের পাওয়া যাচ্ছে পাখিদের আনাগোনা দেখে। প্যাঁচাটা অন্ধকার নামতেই অমঙ্গলসূচক ডাক দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে ওকে।

'কোনকালে কে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তাতে আমার কি!' বিভ্রিড় করে উচ্চারণ করলো কথাগুলো মিলন।

বিশাল আমবাগান। বড় বড় গাছগুলো দেখে মনে হয় ওরা

বট অশ্বখ হয়ে উঠতে চায় বোধহয়। বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথ। দিনের বেলায় পথ দেখা গেলেও ঘন গাছগুলো যেন চাঁদোয়া টাঙিয়ে রেখেছে। সূর্যের আলোকে এখানে প্রবেশ করতে হয় ভয়ে ভয়ে। অথচ এই দীর্ঘ বাগানটা পার হয়ে একটা দুটো মাঠের পরেই মরা নদীর সোঁতা। সেখানে যেটুকু জল থাকে তাতেই সন্ধ্যায় শিকারে বেরুনো হিংস্র জন্তুরা জল খায় নির্ভয়ে। কখনসখনও ভয় পায় চিতার আগুন দেখে।

মিলন দিনের বেলায় এ বাগান পার হলেও রাতে কোনোদিন আসেনি এদিকে। কবে কোন কালে কে একজন এই নির্জন আমবাগানে এসে মরেছিল গলায় দড়ি দিয়ে, আর সেই থেকেই এ আমবাগানের নাম হয়ে গেছে গলায়-দড়ির আমবাগান। মিলনের ব্যাটারী ফুরিয়ে আসা টিমটিমে টচটা আলো না দিলেও চাঁদের আলো পথ দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু আশপাশের ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে যেন ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল সেই ম্লান আলো। তাই নির্ভয়ে দুটো শেয়াল হঠাৎ একটা ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালো মানুষ দেখে। তারপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মিলনের গা ঘেঁষেই ঢুকে গেল আমবাগানে।

‘কিসের গন্ধ!’ মুখে এ কথা উচ্চারণ করলেও এই মিষ্টি গন্ধ বাঘের হতে পারে না তা বুঝতে দেরি হলো না। আমগাছে মুকুল ধরেছে, ফোটা ফুলের গন্ধে মৌমাছির দল ভিড় জমায় এখানে। মধু খেতে এসে তারা গুনগুন শব্দে এতক্ষণ নিশ্চয়ই মাতিয়ে রেখেছিল এই আমবাগান। এখন তারা পলাতক।

বাঘ এই এলাকায় এখন নেই মনে পড়ল মিলনের। অথচ তারা ছিল কিছুকাল আগেও। এটাই ছিল তাদের চারণভূমি। মরা গাঙের সোঁতার জল ছিল তাদের নিত্যকার পানীয়।

পা চালান মিলন। রাত বাড়ার আগে আগে আমবাগান পার হতে হবে তাকে একা। ভয়ডর নেই তার। তবু যেন গাটা কেমন ছমছম করছিল পঁচার ডাকে, শেয়ালের চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে দেখা নেওয়ার ভঙ্গিতে।

একা এই জনমন্ডলীন নির্জন আমবাগানের প্রান্তে এসে গলায় হঠাৎ সুর খেলে গেল মিলনের। সে গলা খুলে গান গাইতে গাইতে বাগানে ঢুকেই গান বন্ধ করল হঠাৎ। মনে পড়ে গেল একবার ডাকাডের পাল্লায় পড়েছিল দুজন এই গলায়-দড়ির আমবাগানেই। যাদের ধরেছিল তারা অবশ্য ডাকাডের কাছের সহজে হার মানতে চায়নি, যেহেতু বয়সটা ছিল উঠতি যৌবনের। একজন যে ভাবেই হোক পালিয়েছিল। অন্যজনের মৃতদেহ পরদিন পাওয়া গিয়েছিল এই বাগানেই। অতএব গান গেয়ে ডাকাত-বাবাজীদের আহ্বান না জানানোই ভাল। কে জানে আশেপাশে তারা কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না! মাথা নিচু করে এসব কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিল মিলন। দ্রুত পা চালানোও মুশকিল। আমগাছগুলো এক এক জায়গায় গায়ে গায়ে জড়িয়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল আকাশমুখে হয়ে।

‘কে?’

সবে বাগানে ঢুকেছে মিলন। গলা খাঁকারি দিয়ে আবারও অস্বাভাবিক জোরে চোঁচিয়ে উঠল, ‘কে?’

টচ ফেলল মিলন, কিন্তু ব্যাটারী কখন ডাউন হয়ে গিয়েছে টেরও পায়নি। অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠল সে দৃশ্য দেখে। পা আপনি থেমে গেল। চোখ বন্ধ করল ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে চায় না বলে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও ঝুলন্ত মৃতদেহ ভাসছিল মনের মধ্যে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে মানুষটার। চোখ দুটো মণিকোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ‘ও বাবাগো!’ ভয়ে চোঁচিয়ে উঠেই পিছিয়ে এল দু পা।

মিলনের ভয়ার্ত চিংকারে সাড়া দিল না কেউ, শুধু ঝিঝিঁ পোকারা ছাড়া। তারা একটানা সুর গাঁথে গানে গানে ওকে অভয় দিচ্ছিল। তার ভয়ের জগতে তারাই একমাত্র জীবন্ত কীটপতঙ্গ।

মিলন পিছিয়ে এলো বটে, কিন্তু চোখ চলে গেল আবার সেদিকেই।

হঠাৎ কোথা থেকে এসে গেল একটা দমকা হাওয়া। গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো দোল খেতে লাগল এদিক ওদিক। আর সেই ফাঁকে ভীক চাঁদের আলোয় মিলন দেখল পা ঝুলিয়ে বসে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি।

মিলন কি ভুল দেখছে? চোখ কচলে নিয়ে আবারও দেখল সাদা কাপড়ে মোড়া দেহটা পা নাচাচ্ছে মহানন্দে।

আতঙ্কে মিলনের সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল। বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরল। এদিক ওদিক চাইতে গিয়েও চোখ ঘুরে ফিরে আবার সেই গাছের ওপর পা-দোলানো মূর্তিটার দিকেই ফিরে গেল।

এতক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসা সাদা কাপড়ের মূর্তিটা ছিল একটু দূরে গাছের দো-ফেঁকড়া ডালে বসে। এখন মনে হচ্ছে পা-দোলানোটা ঘন ঘন বাড়িয়ে মূর্তিটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

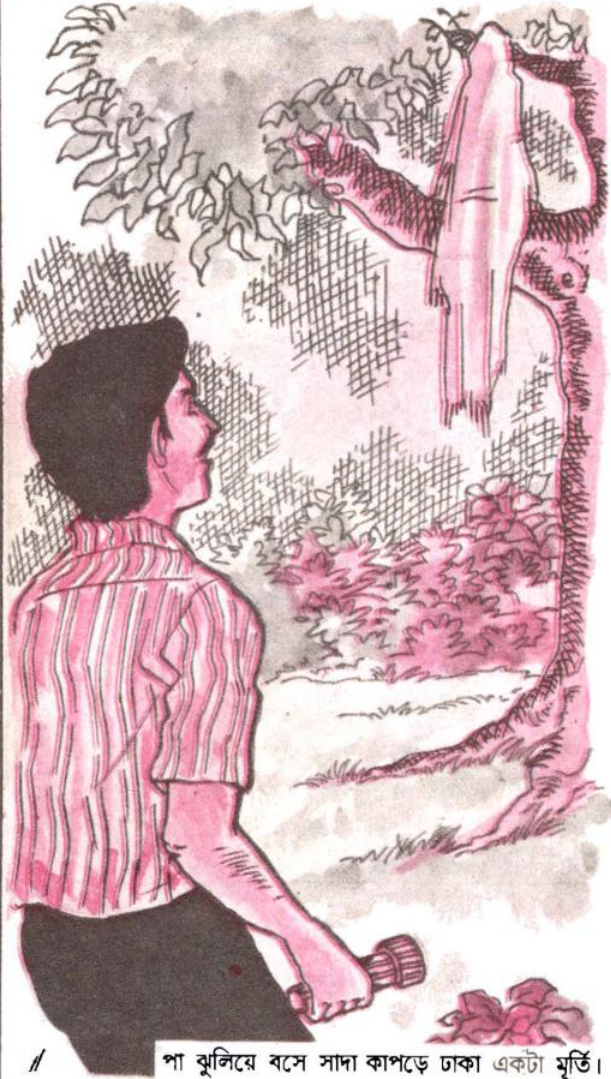
‘কে কোথায় আছো বাঁচাও বাঁচাও আমাকে?’ প্রাণপণে চিংকার করে উঠল মিলন।

কিন্তু কোথায় কে? তার এই চিংকারে সেই সাদা কাপড়ের পা-দোলানি যেন বেড়ে গেল আরও।

‘বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।’

সারা শরীরে কাঁপুনি বাড়ল হাওয়া থেমে যাওয়ায়। বন্ধ হলো ভূতের পা দোলানি। চোখ কচলান মিলন আবারও। সত্যি পা দোলানি কমেছে।

একটু যেন সাহস বাড়ল। সাদা কাপড় বসে ঠিক তার পথের ওপরে একটা গাছে। এখন সবে সন্ধ্যা রাত, তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এমন কেউ নেই। আশেপাশে কোনো লোকালয়ও নেই। এইজন্যই সে দুপুরেই বেরিয়ে আসতে চাইছিল বন্ধুর বাড়ি থেকে। কি করবে সে এখন? ওই ভূত যদি গাছ থেকে নেমে এসে তার ঘাড় মটকায় বাঁচাবার কেউ নেই। ভূতটা নিশ্চয়ই ভালো ভূত। নইলে এতক্ষণে....



// পা ঝুলিয়ে বসে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি।

যেটুকু সাহস বেড়েছিল মিলনের সেটুকু আবার উধাও এই দ্বিতীয় চিন্তায়। যদি সত্যিই নেমে আসে! পা দোলানি বন্ধ হয়েছে সেকি নেমে আসবে বলে?

ভয় বাড়ল। আবার তাকাল সেই দিকে। না এখনও বসে। টটটা ঝালাবার চেষ্টা করল আবারও। নিভন্ত আগুনের ঈষৎ একটু ঝিলিকের মতোই নিভে গেল একেবারে।

কি করবে ভাবছে মিলন। সামনে এগোনোর প্রশ্ন নেই, বন্ধুর বাড়ি ফিরে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। তবু আমবাগানের চেয়ে পিছনের দিকে ফেরাটাই ভাল মনে করে পিছন ফিরতেই চমকে উঠল, ‘কে? কে গো?’

মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি। লম্বা ছুঁচলো মুখ। বড় বড় হলদে দাঁত বার করে শীর্ণ চেহারাটা হেসে উঠল, ‘হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!’

গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল মিলনের। গাছের ভূত এবার বোধহয় নেমে এসে সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল। হাসিটাও

ঠিক ওদের মতোই। ছোট আট হাতি শাড়ি একটা পরনে, গায়ে জড়ান সাদা চাদর।

আবার সেই হাসি, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ! মিলনকে নির্বাক দেখে মূর্তিটা দীর্ঘায়ত করল তার হাসি।

‘কে, কি চাই!’ অস্বাভাবিক জোরে চোঁচিয়ে উঠতেই মূর্তিটা বলে উঠল নাকি সুরে, ‘ভয় পেয়েছেন, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!’

কথাগুলো মানুষের মতন বটে। তবে ওদের মতো নাকি সুর। মুখভরা কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হাতে কালি পড়া একটা লঠন যার আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি।

‘এঁজ্ঞে, আমি ফৈলারাম সিং, ভয় নেই!’

এতক্ষণে মনে হলো ভূতের মতো চেহারা আর কণ্ঠস্বর হলেও আসলে ফৈলারাম এখানে গমের ভুঁয়ে পাহারা দিতে এসেছে। পাকা ফসল চুরি হওয়ার ভয়ের চেয়েও বেশি ভয় বুনো শুয়োর কি রাত-চোরা গরু মোষের। তাই ফৈলারাম আমবাগানের পাশের মাঠে মাচান বেঁধে গম আগলাতে এসেছে। তার ডান হাতে একটা সড়কি আর বাঁ হাতে লঠন। গম কাটা হবে দুই-এক দিনের মধ্যেই। না কাটা পর্যন্ত চলছে তার পাহারা।

‘আমবাগানে ভুঁত দেকেছেন তো,’ বলেই আবার সেই রহস্যময় হাসি ফৈলারামের, ‘হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!’

ফৈলারামের হাসিতে মিলনের পেটের পিলে চমকে ওঠে। এ যেন মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। তাছাড়া আমবাগানে মিলন যে ভূতের ভয় পেয়েছে ও জানল কি করে? ওই ভূতটাই মানুষের রূপ ধরে আসেনি তো!

ভূতুড়ে অন্ধকারে ভরা লঠনটা নিয়ে মিলনের আগে আগে চলেছে ফৈলারাম তাকে তার ডেরায় নিয়ে যেতে। ফুটন্ত তেলে ভাজা ভাজা হুজিল মিলন এতক্ষণে, এবারে আগুনে ঝাঁপ দিল। ফৈলারামের ডেরা মানে চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতে একটা বাঁশের মাচা পাতা তার ওপরে। কতদিন আগে এগুলো তৈরি কেউ জানে না। একে ফৈলারামের মতো তালপাতার সেপাইয়ের ভারে দুর্বল মাচা নড়বড়ে। মিলন তার ওপর চাপতেই মড়মড় করে দুলে উঠল।

‘ফৈলারাম!’

‘ভয় পাবেন না! ওঁ মঁচকাবে তঁবু ভাঁড়বে না!’

মিলনকে মাচানে ঠাঁই দিয়ে নিশ্চিতমনে ফৈলারাম গাঁজার কলকে সাজিয়ে অনুরোধ জানাল দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে গাঁজা ধরিয়ে দিতে। মিলন কি আর করবে! দেশলাই জ্বালিয়ে কলকের মাথায় ছুঁতেই দপ করে জ্বলে উঠল গাঁজার কুণ্ডলিটা। তারপর সে কি টান! বহুকালের ফুরিয়ে যাওয়া নেশা একটানেই মিটিয়ে নেবার আশায় চোঁ চোঁ শব্দ। মনে হলো কলকেটা ফেটে যাবে এখুনিই। যেখানে আগুনের চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি সেখানে ফৈলারামের একটানেই গমগম করে উঠল আগুন।

মিলন ততক্ষণে নাকে কুমাল চাপা দিয়েছে। মরা পোড়ার

গন্ধের মতো তীব্র গন্ধ পোড়া গাঁজার।

‘ইচ্ছে করবেন নাকি!’ দুহাত এক করে খুব ভক্তিবরে এগিয়ে দিল কলকেটা।

‘না!’ গভীর গলায় ধমকের সুরে ওকে নিরস্ত করে শুয়ে পড়ল মিলন মাচার উপরে। শীত শীত করছে। পাশেই ছিল ময়লা একটা কাঁথা। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিতেই দুর্গন্ধে বমি এসে গেল মিলনের। ভাগিয়া, পেটে কিছু নেই তাই বমি হলো না।

সবচেয়ে অবাধ কাণ্ড ভূত নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করল না একবারও। প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করলে যেন তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হলো মনে করে চুপচাপ রইল দুজনেই। ফ্যালারামের চুপ থাকারটা পিছনে একটা কিছু রহস্য রয়েছে। কারণ সেই-ই মিলনের চিংকারে ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ‘আমবাগানে ভূত দেখেছেন তো!’

এই প্রশ্ন পর্যন্তই। সমাধানে এলো না ফ্যালারাম। মিলন ফ্যালারামের কাছে কৃতজ্ঞ এই অবস্থায় তাকে আশ্রয় দেবার জন্য। নইলে তার মৃত্যু ঘটতো আজ।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল মিলনের অনেক মানুষের কণ্ঠস্বরে। গমের ভূঁয়ে শুনোশুয়োঁর তড়াচ্ছে নাকি?

উঠে বসতে প্রথমে ফ্যালারামের নাসিকাগর্জনের আওয়াজ তার ঘুম ভাঙার কারণ মনে হলো। নাসিকাগর্জন না বলে মেঘগর্জন বলাই ভাল। কিন্তু তারপরই অনেক মানুষের কোলাহল এসে গেল কাছে। ‘বল হরি, হরি বোল!’

মড়া নিয়ে চলছে শ্মশানবন্ধুরা। এদিকে মড়া পোড়ানোর ঘাট বলতে ওই একটাই। মিলনের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েকের পথ।

হঠাৎ মাথায় এলো শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে চলে গেলে মন্দ হয় না। রাত শেষ হয়ে এসেছে। ভোরবেলায় বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফ্যালারামকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।

‘বল হরি, হরি বোল!’

কাছে এসে পড়েছে। চারজন মাত্র লোক হেঁটে চলেছে লঘু পায়েরে। ক্রান্ত মানুষগুলোকে দেখে মনে হলো অনেক দূর থেকে আসছে। মালকোঁচা মারা, খালি পা। খড় নেই, শুধু চার জোড়া পা যেন হেঁটে যাচ্ছে। পশ্চিমে হেলে পড়া পাড়ুর চাঁদের আবছা আলোয় দেহের ওপরের দিকটায় শুধু গামছা জড়ানো। আটটা পা-ই প্রথমে নজরে আসে। অবয়বহীন পাগুলো চলেছে মড়া কাঁধে নিয়ে।

‘কাদের মড়া গো?’

লোকগুলোর কাঁধে মড়া। হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। একজন জবাব দিল, ‘এজ্ঞে কাহারদের।’

আবার কোনো প্রশ্ন ছুটে এসে তাদের নীরবতায় ছেদ ঘটায় তাই পিছনের একজন বলল, ‘অপমিত্তা মড়া বাবু, তাই এই

রেতে রেতেই নিয়ে এলাম।’

কি হয়েছে আজকের এই দিনটায়! শনিবার ছাড়া অন্য কোনো তিথি তা জানে না মিলন। আজ যতরকম অঘটন। অপমৃত্যুর মড়া।

‘আপনি কোতায় যাবে?’

মিলনের গম্ভীর শুনে বলল, ‘ভাল! এজ্ঞে শ্মশানঘাটার কাছে গিয়ে আপনি যাবেন উত্তরের পথ ধরে, আমরা দকিনে।’

আবারও সেই বিভ্রাট। ওরা গলায়-দড়ির বাগানের দিকেই যাচ্ছে। বাড়ি যাওয়ার সঙ্গী জুটল যদিও তাও অপমৃত্যুর মড়া। পথ সেই ভুতুড়ে বাগানের মধ্য দিয়েই।

কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল আবারও। মিলন ছিল পিছনে। কিন্তু উঁচু ডালে বসে থাকা ভূত একই জায়গায় একইভাবে বসে।

হঠাৎ পায়ের কাছে কি একটা একবার আগে একবার পিছনে ঘুরঘুর করতে দেখে মিলন জোরে জোরে বলল, ‘আরে এই কালো বিড়ালটা এলো কোথা থেকে?’

‘কালো বিড়াল! লক্ষণ ভাল নয় বাবু। কাঁদে মড়া তাই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না?’

‘কিন্তু বিড়াল ক্ষতি না করলেও মাথার ওপরে ওটা কি দেখেছে?’

চলা থামিয়ে মড়া কাঁধেই চাইল সামনের দুজন। শেষে ডাক মেরে পিছনের লোক দুটোকে দেখাল। প্রথমে ওরা হতভম্ব। মৃদুমন্দ হাওয়ায় পা দোলানো দেখেই ‘ওরে বাবা’ বলেই ওরা মড়াটাকে মিলনের গা ঘেঁষে ফেলে দিয়ে চোঁচা দৌড় দিল যে যোদিকে পারল।

ওরা দৌড় দিলেও মিলনের সে ক্ষমতা ছিল না। খাটুলি-সুন্ধু ফেলে দেওয়ায় মড়াটা তাকে ছুঁয়েই পড়ল মাটিতে। মিলন চিংকার করেছিল কিনা জানে না তবে গোঁ গোঁ শব্দ করে জ্ঞান হারিয়ে মড়ার পাশেই পড়ে গেল ধূপ করে।

জ্ঞান ফিরতে মিলন দেখল মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা মুখ। ‘এঁজ্ঞে আমি ফেলারাম, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। গৌরান ফিরেচে তাঁহলে!’

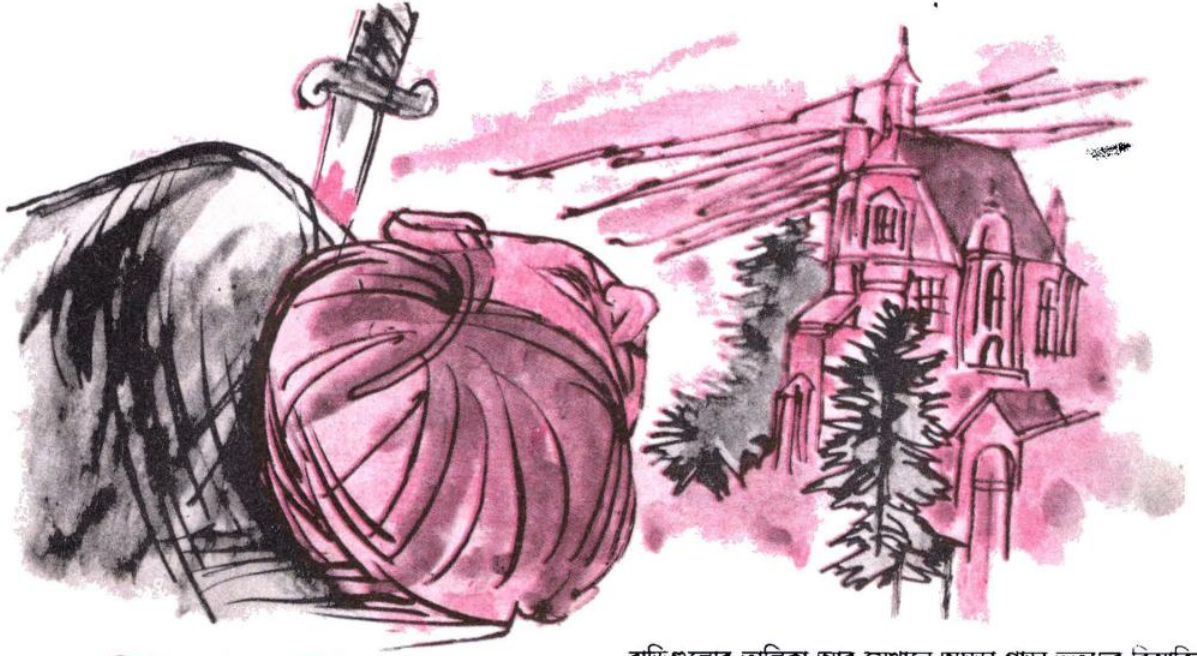
জ্ঞান ফিরেছে আর ভোরও হয়েছে। ফুরফুরে বিশুদ্ধ বাতাস উড়ে বেড়াচ্ছে খেয়ালখুশি মতো। সূর্যদেবের ওঠার তোড়জোড়ও শুরু।

মিলনের মনে পড়ল মড়াটার কথা, ‘মড়াটা কোথায়?’

আবার সেই পরিচিত হাসি, ‘হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। ওঁটাকে দাঁড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে ওঁই হোঁথায় সঁরিয়ে দিলাম বাবু। মাঁছি বঁসছিল কিনা বঁড্ডো!’

মিলন উঠে বসতেই চোখে পড়ল পা-দোলানো ভূত। ভূত উধাও। গাছের ডালে ঝুলছে একটা ছেঁড়া সাদা কাপড়ের ন্যাকড়া। তখনও হাওয়ায় দুলছিল ন্যাকড়াটা। কাল রাতের আলো-আঁধারিতে ওটাই ভূত হয়ে পা দোলাচ্ছিল তার আতঙ্কে ভরা চোখের সামনে।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



খুনী ভূত

সঙ্ঘর্ষণ রায়

ভূতের ভয়ে মরে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ভূত কখনো খুনী হতে পারে না, বললেন ফরেনসিক-বিজ্ঞানী রবীন বসু। এক ডাক্তার বন্ধুর হত্যার তদন্ত করার অনুরোধ নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফরেনসিক-বিজ্ঞানীর কাছে গিয়েছিলেন তিনি। রবীনের এই বন্ধু কেটে একটি পুরনো হানাবাড়ি দেখতে গিয়ে ভূতের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ভূতটি তার বুকে ছোরা বসিয়েছিল।

রবীনের বন্ধুর বুকের মধ্যে আমূল বিঁধেছিল ছোরাটি। রবীন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশেষজ্ঞকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে কোনো ভূতের পক্ষে কারুর বুকে ছোরা বেঁধানো অসম্ভব ব্যাপার।

রবীনের বক্তব্য শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ বললেন, ভূতের পক্ষে কি সম্ভব আর কি অসম্ভব তা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি আমরা, কাজেই এ সম্পর্কে কোনোরকম মন্তব্য আমি করতে চাই না। কিন্তু একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে ঐ হানাবাড়িতে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। অতএব আপনার বন্ধু ভূতের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন।

তারপর তিনি রবীনকে এই হানাবাড়িসহ যে সব ভূতের বাড়ি ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে আছে তাদের সম্বন্ধে বললেন।

বাড়িগুলোর তালিকা আর সেখানে আড্ডা গাড়া ভূতদের বিস্তারিত বিবরণী যে বইতে লেখা আছে তার নামও জানালেন। বইটি 'ব্রিটিশ ভূতদের গেজেটিয়ার' (Gazetteer of British Ghosts)। তার মধ্যে কেটের হানাবাড়িরও উল্লেখ আছে। এই গেজেটিয়ার অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটেনেই ভূতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সে দেশের রাজবাড়িগুলো ভূতের আড্ডা। হ্যাম্পটন কোর্টের প্রাসাদে রাজা অষ্টম হেনরি ও তাঁর পঞ্চম স্ত্রী ক্যাথেরিন হাওয়ার্ডের ভূতের কথা কে না জানে। কেট শহরে রানী এলিজাবেথের খুড়তুতো ভাই মাইকেলের বাগানবাড়িতে আছে একটি সদভূত অর্থাৎ ভালো ভূত। কেউ তার মুখোমুখি হলে সে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু কেটের যে হানাবাড়িতে রবীনের বন্ধু ঢুকেছিল, সেখানে থাকে এক বদভূত। স্থানীয় মানুষদের নিষেধ না মেনে সে সেখানে ঢুকেছিল। সেই ভূতের দেখা যে সে পেয়েছিল তার প্রমাণ ওই মৃতদেহ।

বদভূত নয় বদ মানুষের দেখা পেয়েছিল আমার বন্ধু। রবীন বললেন, যেমন নিষিদ্ধ চোরা-কারবারে লিপ্ত কোনো বদমানুষ...

কি যে বলেন তার ঠিক নেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফরেনসিক-বিজ্ঞানী বললেন। বদভূতের ডেরায় ও রকম বদমানুষ কি থাকতে পারে। বদভূত তার ঘাড় মটকে দেবে না!

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই ফরেনসিক-বিশেষজ্ঞ যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, ভূতের বিশ্বাসে তিনি অটল হয়ে থাকেন। চুকট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে বলেন, ইংলিশম্যান হয়ে ইংলিশ ভূতকে আমি অমান্য করি কি করে বলুন! আমি খুবই দুঃখিত উষ্টর বসু, এই খুনের ব্যাপারে ব্রিটিশ পুলিশের কিছুই করার নেই। ভূত খুন করলেও তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

ছবি : সুফি

বইমেলায় বেরুলো

বাংলা সাহিত্যে দেব সাহিত্য কুটীরের অনবদ্য অবদান

অমরবীর কাহিনী

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া বীরদের নতুন করে চিনিয়ে দেবার জন্যেই দেব সাহিত্য কুটীরের এই প্রচেষ্টা। যুগ যুগ ধরে ভারতমাতাকে রক্ষা করার জন্যে যে বীররা অমর হয়েছেন তাঁদেরই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রজন্মের সামনে, বার্ষিকীর আকারে। ঝকঝকে ছাপা, পাতায় পাতায় ছবিতো ভরা এই বইটি ছোট বড় সকলকে ইতিহাসের পথ বেয়ে নিয়ে যাবে নতুন এক জগতে।



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের দ্বিতীয় বই
ভাঙাবাড়ির রহস্য
গত বইমেলায় এই সিরিজের প্রথম বই
কেল্লা রহস্য
বেরিয়েই বাজার মাত করে দিয়েছিলো

গৌরী দেব

গা ছমছমে ভূতের গল্প

ভয়ে আতঙ্কে ভরা প্রতিটি

গল্পই শিহরন জাগানো!

লেখিকার আর একটি বই—

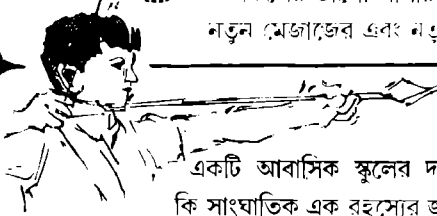
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প



অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সোনার মেডেল

সকলের ভালো লাগার মতো একটি বই। প্রত্যেকটি গল্পই বারবার পড়ার মতো। নতুন স্বাদের, নতুন মেজাজের এবং নতুন ধরনের গল্পের বই যা ছোট বড় সকলকে নতুন পথের হৃদিশ দেবে।



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তীরন্দাজ

একটি আবাসিক স্কুলের দম বন্ধ করা পরিবেশ। তারই মধ্যে ছেলেরা খেলছে, তীর ছুঁড়ে কিন্তু তারা জানে না কি সাংঘাতিক এক রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছে তারা। আর ঐ পোড়োবাড়ির ভূত—যার ভয়ে ছেলেরা কাঁপছে—সেই ভূতের রহস্যই বা কি! রোমাঞ্চের ঘেরাটোপে মোড়া এই বইটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।



স্বাভাব ছাপা হলো

সোনার কাঠি

ছোটদের ভালো লাগার মতো দুটি দুর্দান্ত বই

রাফস খোফস



Dr. Chandra's
SOURCES OF ENERGY

New book in this series

The Story of Geothermal Energy

Already Published

The Story of Wind Energy, The Story of Petroleum

The Story of Nuclear Energy

The Story of Water Energy, The Story of Coal

The Story of Solar Energy



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

**চুল নিয়ে
সমস্যা ?**

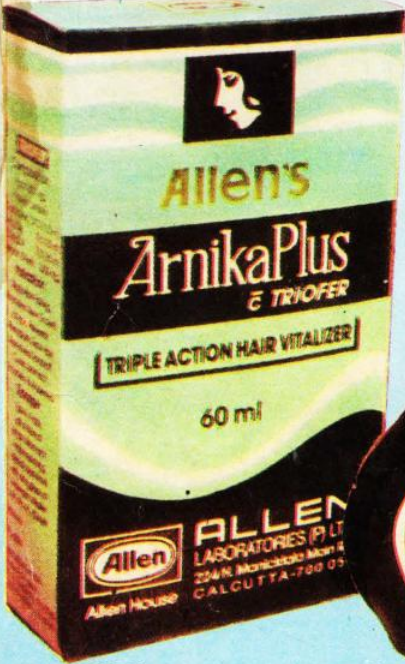
চুল পড়া ? অকালপক্বতা ? খুস্কি ?

এগুলি চুলের কোন রোগই নয়, রোগের
উপসর্গ মাত্র। তাই সমাধানের জন্য মাথায়
লাগানোর ওষুধের সঙ্গে সঠিক খাওয়ার
ওষুধেরও প্রয়োজন।

.... ডাঃ সরকার



খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান, **আর্নিকাপ্লাস** লাগান আর **ট্রায়োফার** খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধ করে, চুলের পুষ্টি জোগায়, অকালপক্বতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়, চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়, আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।



বিশেষ সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার—

“**আর্নিকাপ্লাস**-তেলবিহীন হেয়ার লোশন ও
ট্রায়োফার ট্যাবলেট-হোমিও হেয়ার টনিক”

একই অভিনব প্যাকে।

প্যাক: ৬০ মিলি ও ১০০ মিলি।

ব্যবহার বিধি:

প্যাকের ভিতর দ্রষ্টব্য।

আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল্ অ্যাকশন্ হেয়ার ভাইটালাইজার

কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ

লিভেসিন নির্মাতাদের

সহযোগী সংস্থা **Allen** -এর

হোমিও গবেষণার একটি উপহার।

এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ

এ্যালেন হাউস : কলি-৫৪, ফোন : ৩৬-৩০৯৬

এ্যালেন ভবন : কলি-৫৯ ফোন : ৫৯-৪০৫১

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।



Marketed by :



**Allen's India
Marketing Pvt. Ltd.**

ArnikaPlus Apartment, Sealdah

35, A. P. C. Road, Calcutta-9

Phone : 350-9026

Allen Apt : 351-0062



Allen's Ind. India